সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক

শ্রীসুনীল মণ্ডল

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট

শ্রীগণেশ বসু

৫১৫ সাবকুলার রোড

হাওড়া-৪

ব্লক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

১৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ইম্প্রেসন্ হাউস

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা-৯

মুদ্রক

শ্রীপঙ্কজকুমার দোলুই

নিউ মহামায়া প্রেস

৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট

কলকাতা-৭৩।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত মহাভারত

যাঁর ছিল পরম প্রিয়

স্বর্গতা মাতৃদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত।

লেখকের কথা

একটা সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে বলেই প্রাচীন মহাকাব্যের আবেদন ও আকর্ষণ সর্বকালীন ও সর্বজনীন। কিন্তু কালে কালে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। তাই একালের মানুষ মহাকাব্য পাঠে আগ্রহী হলেও আধুনিক মন প্রকৃত পরিতৃপ্তি পায় প্রাচীন কাহিনীর যুগোপযোগী রূপায়ণে, নব ভাষ্যে। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, হৃদয় যাতে সাড়া দেয় না, প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কার ও মূল্যবোধের যা বিরোধী তা যতই অলৌকিক হোক না কেন আধুনিক মন তা মেনে নিতে চায় না। তাই একালের রামায়ণ কথায় রামের চেয়ে রাবণ ও মেঘনাদেরই বেশি মর্যাদা। মহাভারতের বারবনিতা রবীন্দ্রকাব্যে মহীয়সীর মর্যাদা পায়।

প্রাচীন কাহিনীর নব রূপায়ণের এই স্বাধীনতা শুধু আধুনিক মনকে পরিতৃপ্ত করার জন্য নয়, সৃষ্টির প্রয়োজনেও অনস্বীকার্য। কারণ সৃষ্টির মূল কথাই হলো গুপ্তকে ব্যক্ত করা, সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত, প্রত্যয়সিদ্ধ করে তোলা।

এই শিল্প-সত্যের কথা মনে রেখেই মহাভারতের এমন একটি চরিত্র এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছি যার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা সুপ্তই থেকে গেছে। রূপ যৌবন, বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস কোনো কিছুরই অভাব ছিল না দ্রৌপদীর। এসব ছাড়াও ছিল নারীত্বের এমন এক দীপ্তি যা নারীচরিত্রে দুর্লভ। মহাভারতের দ্রৌপদী রূপে গুণে অনন্যা। উদ্ভিন্নযৌবনা যে দ্রৌপদীকে স্বয়ংবর সভায় দেখে সমাগত রাজকুল মোহিত হয়েছিলেন সেই দ্রৌপদীকে মধ্যবয়সে দেখেও জয়দ্রথ বলেছিলেন—'এঁর তুলনায় আর সব নারী বানরীতুল্যা।' পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পর্যন্ত রূপে গুণে অনন্যা দ্রৌপদীকে 'সখি' বলে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু এহেন ক্ষণজন্মা নারীর হৃদয়ের প্রেম নিবেদন ব্যর্থ হলো কেন? স্বয়ংবরে অর্জুনের মতো বীর পতিলাভ করেও কেন তার ভাগ্যে জুটলো পঞ্চপতিত্বের বিড়ম্বনা? বহুপতিত্ব একটা নারীর জীবনে যে কত বড় ট্র্যাজেডি হতে পারে সে কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ থাকলে নারীত্বের পক্ষে অতবড় অমার্যদাকর একটা পরিণতি কুন্তীদেবীর এক অসতর্ক মুহূর্তের ভুলের মাশুল বলে চালানোর কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হতো না।

স্বয়ংবর সভায় সদ্যলব্ধা দৌপদীকে নিয়ে পর্ণকুটিরে প্রত্যাগত পুত্রের মুখে দ্রৌপদীর নাম ও ভিক্ষা আনার কথাটা শোনামাত্র কুন্তীদেবীর সেই নেপথ্য নির্দেশ 'যা এনেছ, পাঁচজনে ভাগ করে নাও', পঞ্চপাণ্ডবের কাছে যতই অমোঘ হোক, কাহিনীর পারম্পর্যরক্ষা ও ঘটনা বিন্যাসের বিচারে যে খুবই দুর্বল বোধ করি সেটা উপলব্ধি করেই স্বয়ং ব্যাসদেবকে পাণ্ডবদের বিবাহ সভায় হাজির হয়ে রাজা দ্রুপদকে

শোনাতে হয়েছিল পাণ্ডবদের পূর্বজন্মের গোপন অলৌকিক কাহিনী। কিন্তু স্নেহান্ধ দ্রুপদ তবু কিংকর্তব্য বিমূঢ়! তাই শেষ পর্যন্ত এই বিধান দিতে হয়েছে যে, সাধারণের ক্ষেত্রে যা গর্হিত পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে সেটাই বিধেয় ও মঙ্গলকর।

দ্রৌপদীর মতো স্ত্রী লাভ পঞ্চপাণ্ডবের মহাসৌভাগ্য হতে পারে কিন্তু দ্রৌপদীর? তার জীবনে এই বহু পতিত্ব একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। নারীত্বের এতখানি অমর্যাদার পরে জীবনের পরিণতি ট্র্যাজিক ছাড়া আর কি হতে পারে? কিন্তু তা হয় নি। মহাভারতে অর্জুন প্রিয়া দ্রৌপদী পঞ্চপতিত্বের শুধু নির্বিচার নয়, তাদের সকলের প্রতি অনুরাগ শ্রদ্ধা প্রকাশ অকুণ্ঠ। সর্বোপরি তার সমস্ত চিত্তবৃত্তি যেন কৌরবসভার লাঞ্ছনার প্রতিকারে উন্মুখ।

সমগ্র মহাভারত-কাহিনীর যথার্থ রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে এছাড়া আর কোনো পথ হয়ত ব্যাসদেবের ছিল না। যে যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজেদেরই পরাজিত বলে মনে হয়, স্বয়ং কৃষ্ণ পর্যন্ত চেষ্টা করেও যে যুদ্ধ নিবারণ করতে পারলেন না, যে যুদ্ধের ধ্রুব পরিণতি মহাপ্রস্থান, সেই সর্বনাশা সর্বগ্রাসী আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিল কিন্তু পাণ্ডব জায়া দ্রৌপদীর চোখের তারায়, শাণিত বাক্যবাণে! তাই সে চরিত্রে ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা প্রত্যয়সিদ্ধ হলো না। যদি হতো তাহলে ঘটনাচক্রে প্রবঞ্চিতা নারীর ব্যর্থতার মর্মদাহ, অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষের শয্যাসঙ্গিনীরূপে ভালবাসার বেদীমূলে তিলে তিলে আত্মদান কি তাকে পাষাণী করে তুলতো না? আধুনিক যৌন বিজ্ঞানও কিন্তু সেই কথাই বলে।

একটি পুরুষের উদ্দেশে নিবেদিত প্রেম পাঁচজনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, লব্ধ মাতৃত্ব-টুকু সম্বল করে বেঁচে থাকার যে ট্র্যাজেডি তা কি শুধু কৌরবদের হাতে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ কামনা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়!

এ প্রশ্ন আধুনিক মনের প্রশ্ন। একালের অনেক মেয়ের জীবনেও কি আমরা এরকম ট্র্যাজেডি ঘটতে দেখছি না? পাঞ্চালী চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতির চিন্তা একালের মনকে পেয়ে বসে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সেকালের নায়ক নায়িকার মুখে একালের উপযোগী সংলাপ যুগিয়েছি, ঘটনার নতুন ভাষ্য করেছি। উদ্দেশ্য পাঞ্চালীকে স্বমহিমা ও প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলা। এ প্রয়াসের সাফল্য বিচার করবেন একালের পাঠক পাঠিকা। আমি শুধু সাধুবাদ জানাই প্রকাশক সুনীলবাবুকে যিনি নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সাধারণী করে তোলার সুযোগ করে দিলেন উপন্যাসটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পাঞ্চালী

১

যজ্ঞসেনস্য দুহিতা দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ।
বেদীমধ্যাৎ সমুৎপন্না পদ্মপত্রনিভেক্ষণা ॥
দর্শনীয়াঽনবদ্যাঙ্গী সুকুমারী মনস্বিনী।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী দ্রোণশত্রোঃ প্রতাপিনঃ ॥

*   *   *   *

স্বসা তস্যানবদ্যাঙ্গী দ্রৌপদী তনুমধ্যমা।
নীলোৎপলসমো গন্ধো যস্যাঃ ক্রোধাৎ প্রবার্তিবে ॥

পাঞ্চাল রাজধানীতে আজ যজ্ঞ-হোম-পূজাপাঠ, আনন্দ উৎসবের বিপুল আয়োজন। মহারাজ দ্রুপদের স্নেহের দুলালী পাঞ্চালী বারো পূর্ণ করে তেরো বছরে পা দিলে। সাত দিন আগে থেকেই আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে রাজধানী। নগরবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা বিচিত্র অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। দেশ-দেশান্তর থেকে আনা হয়েছে নিপুণা নটী, নর্তক-নর্তকী আর সঙ্গীতজ্ঞ। প্রতি সন্ধ্যায় সুসজ্জিত মঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে সুমধুর সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য। অগণিত দর্শক সমাবেশে রঙ্গভূমিতে তিল-ধারণেরও স্থান নেই। নানা রাজ্য থেকে আমন্ত্রিত হয়ে বহু মান্যগণ্য অতিথিও এসেছেন পাঞ্চাল রাজধানীতে। মহারাজ দ্রুপদ স্বয়ং অতিথি-শালায় গিয়ে তাদের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখছেন।

অতি প্রত্যূষে স্নান-আচমন সেরে মহারাজা ও মহারাজ্ঞী কুলদেবতার কাছে কন্যার দীর্ঘজীবন, সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেছেন। শুভ মুহূর্তে যজ্ঞ-হোম সমাপন করে কুলপুরোহিত নির্মাল্য, মঙ্গল-সূত্র ও মঙ্গলের সামগ্রী নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

যাজ্ঞসেনীকেও স্নান করিয়ে মূল্যবান বস্ত্র-অলংকারে সাজানো হয়েছে।

চন্দন-অগুরু নিষিক্ত গাত্র সুরভিতে উৎফুল্ল যাজ্ঞসেনী যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো শোভা পাচ্ছে রাজদম্পতির পাশে। মাথায় নির্মাল্য স্পর্শ করে হাতে মঙ্গল-সূত্র বেঁধে দিলেন পুরোহিত। কপালে এঁকে দিলেন পবিত্র হোম-শিখা। পবিত্র যজ্ঞাগ্নি স্পর্শ করালেন মাথায়, বক্ষে কপালে।

কিশোরী পুরোহিত ও পিতামাতার চরণধূলি নিলে। মহারাজ তার মস্তক আঘ্রাণ করে স্নেহের কণ্ঠে বললেন—আয়ুষ্মতী হও মা, যোগ্য পতি লাভ কর। বীর পুত্রের জননী হও মা।

কুলপুরোহিত মন্ত্রপূত শান্তিবারি বর্ষণ করলেন সকন্যা রাজদম্পতির আনত শিরে। কিশোরী কণ্ঠে কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করে বললে—তাত, আপনি তো কতবার বলেছেন আমি তোমার মা জননী, আর আপনি আমার সন্তান। আবার আজ একটু আগে বললেন বীর পুত্রের জননী হও মা। কত পুত্রের জননী হব আমি বলুন তো?

দ্রুপদ হাসলেন।

—তাত ঠিকই বলি। তুমি আমার মা জননী! তা বলে এই বৃদ্ধ ছাড়া আর কারও বুঝি মা হবে না!

মহারাজ্ঞী নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর স্নেহমাখা দৃষ্টি কন্যার মুখের দিকে। বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণের মতো শ্যামল-পেলব অঙ্গকান্তি দেখে আদর করে নাম রেখেছেন কৃষ্ণা। কন্যার কথা শুনে হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণার চিবুক ধরে বললেন—পাগলী মেয়ে। এখন চলো প্রসাদ খাবে। তারপর এসে আবার না হয় ঝগড়া করো।

মায়ের হাত ধরে কিশোরী পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। দ্রুপদ তাকিয়ে থাকেন। কত কথা মনে পড়ে। কত আগেকার কথা।

বেশ শান্তিতেই কাটছিল দিন। নিরুপদ্রব রাজত্ব। হঠাৎ কি দুর্দৈব ঘটে গেল। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সসৈন্যে আক্রমণ করলে পাঞ্চাল রাজ-ধানী। রাজধানী রক্ষার জন্য অগ্রসর হতে হলো অবিলম্বে। অনেক যুদ্ধের পর হতবল হতমান কৌরবেরা যখন রণে ভঙ্গ দিলে ঠিক সেই সময়েই পাণ্ডবেরা ঘর প্লাবনের গতিতে গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলো। তুমুল

যুদ্ধ বাধলো আবার। ক্লান্ত পাঞ্চাল সৈন্যদের সেনাপত্য করছিলেন দ্রুপদের ভাই সত্যজিৎ। কিছুক্ষণ পরে সত্যজিৎ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। দ্রুপদ একাই প্রবল বিক্রমে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। পাণ্ডুর চার পুত্র দ্রুপদের সে আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারলে না। কিন্তু অর্জুন সেদিন যেন দৈববলে বলীয়ান। এক অসতর্ক মুহূর্তে পরিশ্রান্ত দ্রুপদকে বন্দী করে নিয়ে গেল তাদের অস্ত্রগুরু দ্রোণের কাছে। তখন বুঝতে পারলেন দ্রুপদ কার নির্দেশে এবং কেন এই অকস্মাৎ আক্রমণ। তাঁকে দেখে দ্রোণ পরিহাসের সুরে বললেন—মহারাজ, ভয় নেই। আপনার প্রাণনাশ এই ব্রাহ্মণের অভিপ্রেত নয়। তবে আপনি আজ রাজ্যহীন। পাঞ্চাল আজ আমার অধিকারে। আপনি হয়ত ভুলে যান নি যে, রাজার সখ্যতা রাজার সঙ্গেই সম্ভব। রাজ্যহীন দ্রুপদকে আমি পাঞ্চালের অর্ধাংশ ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনার সখ্যতার বিনিময়ে।

দ্রোণের সেই হীন প্রস্তাবও সেদিন মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু ক্ষুব্ধ দ্রুপদ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে অর্ধরাজ্যে ফিরে যান নি। কঠিন সঙ্কল্প নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছেন উপযুক্ত যাজকের সন্ধানে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করলে নিঃসন্তান মহারাজ্ঞী সন্তানবতী হবেন আর সেই সন্তান পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

অনেক অন্বেষণের পর সন্ধান মিললো দুই শক্তিধর ব্রহ্মর্ষির। যাজ আর উপযাজ। দুই ভাই। একবৎসর সাধ্যসাধনার পর দুই ভাই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে সম্মত হলেন। দ্রুপদ তাঁদের নিয়ে ফিরে এলেন রাজধানীতে। তারপর শুভদিনে শুভ মুহূর্তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ রাজা দ্রুপদকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, যজ্ঞ সফল হয়েছে। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ শেষে মহারাজ্ঞী যথাকালে পুত্রবতী হবেন। সেই নবজাতক রাজার শত্রুনিধনে সমর্থ হবে।

দ্রুপদ খুশি হয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুত প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে যাজকদের বিদায় দিলেন। তারপর দীর্ঘ একবৎসর শুদ্ধচিত্তে পূজাপাঠ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ করে মহারাজ্ঞী শুধু পুত্রই নয়, একটি কন্যাও লাভ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন

আর যাজ্ঞসেনী। যথাসময়ে জাতক-জাতিকার সংস্কার ও শাস্ত্রাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো উপযুক্ত আচার্যের নির্দেশে। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নকে অস্ত্র-শিক্ষার জন্য পাঠানো হলো অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে। উদ্দেশ্য দ্রোণ-বধের জন্য দ্রোণের কাছেই অস্ত্রশিক্ষালাভ। দ্রোণাচার্যও সব জেনে শুনেও যশো-হানির আশঙ্কায় ফেরাতে পারেন নি ধৃষ্টদ্যুম্নকে। অস্ত্রশিক্ষা এখনও শেষ হয় নি। তাছাড়া শত্রুনিধন করতে হলে উপযুক্ত সময় সন্ধান করাও প্রয়োজন। তাই দ্রুপদ সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। হঠাৎ নিজের চোখ দুটির ওপর কন্যার কোমল করপল্লব এসে পড়ায় চিন্তায় ছেদ পড়ে।

—বলুন তো, আমি কে ?

স্নেহের খেলায় দ্রুপদও যোগ দেন। একটু চিন্তার ভান করে উত্তর দেন—ও বুঝেছি। নিশ্চয় সুকৃত। সত্যজিতের সেই দুষ্ট ছেলেটা।

খিলখিল করে হেসে ওঠে পাঞ্চালী।

—হলো না, হলো না। ঠিক করে বলুন আবার।

কন্যার হাত দুটি সস্নেহে ধরে দ্রুপদ বলেন—তাহলে নিশ্চয় আমার মা-জননী। পিছন থেকে সামনে এসে দাঁড়ায় পাঞ্চালী। সাদরে কোলের কাছে নিয়ে কুঞ্চিত কেশে হাত বুলিয়ে দেন দ্রুপদ। ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে কিশোরী চঞ্চল হয়ে পড়ে। দ্রুপদ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন—কিছু বলবে মা ?

—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পাঠিয়েছেন কত দূর হস্তিনাপুরে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে বলুন তো ? কতদিন দেখি নি। মন কেমন করে না তোমার ?

—পাগলীর যে খুব মন খারাপ হয়েছে তা বুঝতে পারছি। আমারও যে হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু কি করবো মা। ক্ষত্রিয়ের পুত্র। পাঞ্চালের ভাবী রাজা। অস্ত্রবিদ্যা ভালো করে আয়ত্ত না করলে চলবে কেন। দূতমুখে সংবাদ পেয়েছি কুমার ভালোই আছে। অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ হয়ে উঠছে। আর মাত্র দুটো বৎসর। তারপর সে ফিরে আসবে রাজধানীতে। তখন কত মজা হবে, কি বলো মা ?

মাথা নেড়ে পিতার কথায় সায় দিয়ে পাঞ্চালী অন্য প্রসঙ্গ তোলে।—পিতা, আমার আচার্য মস্ত পণ্ডিত। কত শাস্ত্রবাক্য শোনান। আবার দেশবিদেশের খবরও বলেন কত। এই সেদিন বলছিলেন বৃষ্ণিকুলের বসুদেবপুত্র কৃষ্ণের কথা। বালক কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন তখনই নাকি অনেক রাক্ষস-রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন। তারপর একটু বড় হয়ে মথুরায় এসে রাজা কংসকেও নাকি বধ করেছেন! কংস নাকি খুব শক্তিশালী ছিলেন। তাঁকে যখন বধ করতে পেরেছেন তখন কৃষ্ণ নিশ্চয় মহাবীর, না বাবা?

কন্যার মুখে বীর-প্রশস্তি শুনে খুশি হন দ্রুপদ। মথুরা-রাজ কংসের নিধনের সংবাদ যথাসময়েই তাঁর কর্ণগোচর হয়। তিনিও বিস্মিত হন কৃষ্ণের মতো একটা বালকের হাতে কংসবধের সংবাদ শুনে। ক্রমশঃ গুপ্তচর নিয়ে আসে আরও অনেক গুহ্য সংবাদ। কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ কংসহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বারবার দ্বারকা আক্রমণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন চেদীরাজ শিশুপাল। সমগ্র ভাবতে কতকগুলি অশুভ শক্তি যেন সম্মিলিত হচ্ছে জরাসন্ধ আর শিশুপালের নেতৃত্বে। আরও শুনেছেন কৃষ্ণের নেতৃত্বে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণও সংঘবদ্ধ হয়েছেন জরাসন্ধের প্রতিরোধে। বৃষ্ণিগণ শক্তিবৃদ্ধির জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন। দ্রুপদের মনে পড়ে মহারাজ পাণ্ডু তাঁরও সুহৃদ ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুপুত্র অর্জুন! মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে তার হাতে পরাজয়ের কথা। সেই কিশোর অর্জুন এখন যুবক। কৃষ্ণও যুবক। হয়ত অর্জুনেরই সমবয়সী। কাজেই অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। কৃষ্ণ প্রসঙ্গে ছেদ পড়ে। বিশ্বস্ত চর এসেছে গোপন সংবাদ নিয়ে।

যাজ্ঞসেনী অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ায়। আনমনা হয়ে চলতে চলতে প্রাসাদের অন্তরালবর্তী উদ্যানে এসে পড়ে। বড় ভালো লাগে তার এই উদ্যানটি। চারপাশে গাছগাছালীর মেলা। মাঝখানে একটি জল-টলটলে দীঘি। অজস্র পদ্ম-শালুকে ভরা। দীঘির চারপাশে পায়ে চলার পথ। উত্তর কোণে একটা সুন্দর লতা-কুঞ্জ। ভেতরে একটা প্রশস্ত মর্মর-বেদী।

পাঞ্চালী এসে বসলো সেই বেদীতে। কোকিলের কলকণ্ঠে উদ্যান মুখরিত। অন্য সময় এই অন্তরালে বসে কুহু স্বর তুলে উদ্‌ভ্রান্ত করে কলকণ্ঠীদের। কিন্তু আজ সে নীরব। মনে একরাশ বিস্ময় আর ভাবনা।

২

অসীম বাহুবলের সঙ্গে কৃষ্ণের দেবদুর্লভ রূপমাধুরীর কথাও শুনেছে যাজ্ঞসেনী। শুনেছে সেই শ্যামল কিশোরের টানা টানা চোখের দৃষ্টি কখনো স্নিগ্ধ, কখনো রহস্যময়। আজানুলম্বিত বাহুতে নানা অলংকারের শোভা। আর সব শোভার সার তাঁর বক্ষে দোলানো কৌস্তুভ মণির দ্যুতি। এমনি দিব্যসুন্দর সেই দেহের কান্তি যে, দেখামাত্রই কামিনীকুল মোহিত হয়ে পড়ে। প্রথম যেদিন কৃষ্ণ মথুরায় এলেন কংসকে বধ করতে সেদিন মথুরার যত কুলনারী আকুল নয়নে তাকিয়েছিল সেই নবজলধরসদৃশ মোহন মূর্তির দিকে।

সূর্য তখন প্রায় মাঝ আকাশে। যে উদ্যানকে চাঁদনী রাতে মায়াময় বলে মনে হয়, দিনের আলোয় তা যেন বড় স্পষ্ট। কৃষ্ণা তাই ছায়াঘন লতা-কুঞ্জের অন্তরালই বেছে নিয়েছে তার নিভৃত চিন্তার উপযুক্ত স্থান হিসাবে। আচার্যের কাছে যে কিশোর কৃষ্ণের কথা উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে তার কথাই ভাবছিল মর্মর বেদীতে গা এলিয়ে দিয়ে। গাছপালা ছুঁয়ে আসা স্নিগ্ধ বাতাসের ছোঁয়ায় কেশচূর্ণ বারবার ললাটপ্রান্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটা সুখের আমেজে চোখদুটি বুজে আসে।

দূর থেকে একটা মধুর ধ্বনি ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসে। নূপুরের নিক্বণ বলেই মনে হয়। তারপর চোখে পড়ে এক শ্যামল কিশোর মূর্তি। রক্তাভ ওষ্ঠে ভুবনমোহন হাসি। কোমল নয়নে প্রীতির ছোঁয়া। ঠিক সেই সাজ।

কর্ণে কুণ্ডল, মাথায় শিখিপুচ্ছ, গলায় বনমালা, কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি। সুগভীর নাভিতলে পীতধড়া।

সর্বাঙ্গে আনন্দ-শিহরণ অনুভব করে পাঞ্চালী। এতক্ষণ যাঁকে দেখার জন্য প্রাণ আকুল হয়েছিল সেই বিশ্ববিজয়ী বালক বীর কৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছেন তার কাছে! ঘন ঘন রোমাঞ্চ জাগে। পুলকের তরঙ্গে-তরঙ্গে হৃদয় ভেসে যায়।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। ক্রমশ দ্রবীভূত হতে হতে সেই মূর্তি যেন এক অলোকরশ্মির মতো তার দিকে এগিয়ে আসে। কাছে, আরও কাছে। সর্বাঙ্গ নিষিক্ত করে সেই আলোকরশ্মি যেন তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। দেহ-মনের প্রশান্তি প্রতিফলিত হয় মুখের হাসিতে। বড় মধুর সে হাসি।

পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে চমক ভাঙে। মুখের কাছে মাথা নুইয়ে প্রিয় সখি মন্দিরা ডাকছে—সখি, এই ভর দুপুরে তুমি এখানে ঘুমিয়ে আছ! এদিকে তোমাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে মহারাজ্ঞী অস্থির। অন্তঃ-পুরের কোথাও দেখতে না পেয়ে উদ্যানে এলাম। তারপর খুঁজতে খুঁজতে লতাকুঞ্জে। হাসি আর আনন্দে ভাসছে তোমার মুখখানি। মনে হচ্ছে তুমি কোনো সুখস্বপ্নে মশগুল ছিলে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসে পাঞ্চালী। তবে কি এতক্ষণ স্বপ্নই দেখ-ছিল সে! হায়, এ স্বপ্ন যদি সত্য হতো।

এমনি করে দিন যায়। প্রতিদিনই কৃষ্ণা এসে বসে সেই নিভৃত লতা-কুঞ্জে। আবার যদি সেই পরম বাঞ্ছিত এসে দাঁড়ায় সামনে। যাঁকে সে দেখেছে, জেনেছে, সেই মূর্তিখানি চিন্ময় করে তোলে হৃদয়ে। আত্মনিবে-দন করে তার কৈশোর-হর, জীবনের পরম পুরুষ কৃষ্ণের কাছে। ভাবে চোখের দেখা নাই বা মিললো। হৃদয় ভরে রয়েছেন যে তার জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন নওল-কিশোর কৃষ্ণ।

হাসি-খুশিতে সদা উচ্ছল পাঞ্চালীর এই মুগ্ধারতি ভাব মহারাজ্ঞীর দৃষ্টি

এড়ায় না। চিন্তিত হয়ে পড়েন। কি হলো মেয়েটার! সর্বক্ষণই যেন একটা ভাবের আরতিতে সে ডুবে থাকে। মন্দিরাকে নির্দেশ দেন গোপনে কৃষ্ণার মনের খবর নিতে। মন্দিরাও ঠিক বুঝতে পারে না কি হলো সখির। কোথায় গেল তার সেই কৌতুকলীলা। উদ্যানের ঝুলা শূন্য পড়ে থাকে। রাশি রাশি ফুল ফোটে, ঝরে পড়ে। যাজ্ঞসেনী আগের মতো ফুলের মালা গাঁথার জন্য অস্থির হয় না। মন্দিরা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। লতা-কুঞ্জে যাজ্ঞসেনীর পাশে বসে তার হাতখানি ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—আচ্ছা সখি, তোমার কি হয়েছে বলো তো? তোমার মুখখানি দেখলে মনে হয় তুমি যেন আমাদের সবাইকে ভুলে অন্য কোনো কথা ভাবছ দিনরাত। বলো না, সখি, কি হয়েছে তোমার?

পাঞ্চালীর মুখে ম্লান হাসি।

—দেখ মন্দিরা, আমি নিজেই বুঝি না কি হয়েছে আমার। আচার্যর কাছে শুনেছিলাম যে, বেদে এক শ্রেণীর মেয়েকে বলা হয়েছে 'সোমাবিষ্টা'। তবে কি আমিও সোমাবিষ্টা!

মন্দিরা নেহাতই অশিক্ষিতা নয়। তবু পাঞ্চালীর কথা ঠিক বুঝতে পারে না। আবার প্রশ্ন করে—কি বলছ সখি! সোমরস তুমি কোথায় পাবে যে সোমাবিষ্টা হবে!

—নারে পাগলী, সোমরস পান করে কেউ সোমাবিষ্টা হয় না।

এমনি করে একটা মধুর ভাব-ঘোরে যাজ্ঞসেনীর কৈশোরের দিন কাটে। কৃষ্ণের উদ্দেশে মন বলে—নাই বা পেলাম বাইরে। তোমার পরশ পেয়েছি আমার মর্মের অতলে। তাতেই আমি সার্থক। তুমি চিরদিনই এমনি করে থাকো আমার মর্মখুশী হয়ে। আমার দেহ-মন-হৃদয় তোমাময় হয়ে থাক।

কৈশোরের বেলা শেষে দেহে জাগে যৌবন। সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, লাবণ্যে টলটল করে। শ্যামাঙ্গী যাজ্ঞসেনীকে উজ্জ্বলা দেখায়। বাতাসে ভাসে গায়ের সুগন্ধ। স্নান-প্রসাধনের সময় নিজেকে দেখে নিজেই বিস্মিত। মুগ্ধা কিশোরী হয় কুতূহলী যুবতী সুরভিত মালার মতো দেহ-

বল্লরী নিয়ে কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে যাজ্ঞসেনী। মনে জাগে একটা প্রত্যাশা। হৃদয় উন্মুখ হয় না-জানা কোনো দয়িতের আগমনের প্রতীক্ষায়। কিন্তু কে সেই কৌমার-হর বর ? কোথায় খুঁজে পাবে তাকে ? কে দেবে সাড়া!

৩

পঞ্চাল রাজধানী আবার আনন্দ-মুখর। দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা শেষ করে কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ফিরে এসেছেন পাঞ্চালে। কতদিন পরে দেখা। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে অগ্রজের। পাঞ্চালী আর তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। কখনো অগ্রজের কক্ষে, কখনো উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে বিচিত্র নানা কাহিনী শোনে। কথায় কথায় ধৃষ্টদ্যুম্ন একদিন শোনালে দ্রোণাচার্যের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে কৃতী শিষ্য পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের কথা। অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা, লক্ষ্যভেদের প্রশংসায় দ্রোণ নাকি পঞ্চমুখ। অর্জুনের কথা বলতে গিয়েই দ্রোণ শুনিয়েছেন অর্জুন বাল্যে গুরু দক্ষিণা দেওয়ার জন্য দ্রোণের আদেশেই কিভাবে মহারথ দ্রুপদকে বন্দী করে দ্রোণ সমক্ষে হাজির করেছিলেন।

পিতার পরাজয়ের অজানা কাহিনী বলতে গিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের কণ্ঠে উত্তেজনা প্রকাশ পায়।—দেখ কৃষ্ণা, হয়তো কোনো অসতর্ক মুহূর্তে অর্জুন পিতাকে পরাস্ত করে থাকতে পারেন কিন্তু তাই বলে তাঁর মতো প্রবীণ মহারথীকে ঐ ভাবে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া অর্জুনের উচিত হয় নি। পিতার অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেব আমি।

বালক অর্জুনের কাছে তার মহাবীর পিতার পরাজয় ও নিগ্রহের কাহিনী শুনে বিস্মিত হয় পাঞ্চালী। একথা যদি সত্য হয় তাহলে বলতেই হবে যে মহাবীর অর্জুন বাল্যাবধি যুদ্ধে অজেয়। পিতার অসম্মানের ঘটনায় দুঃখ বোধ করে কিন্তু অর্জুনের নিন্দায় মন সায় দেয় না। ধৃষ্টদ্যুম্নের

দিকে তাকিয়ে বলে—ভ্রাতঃ, যা শুনলাম তাতে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, অর্জুন কোনো অন্যায় করেন নি সেদিন। তিনি যদি জয়ের গর্বেই.সেদিন পিতাকে বন্দী করতেন তাহলে অবশ্যই সে কাজ নিন্দনীয় হতো। কিন্তু ভুলে যেও না যে, গুরুর নির্দেশেই অর্জুন সে কাজ করেছিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের কণ্ঠে বিস্ময় আর উত্তেজনা ফোটে।

—বলিস কি কৃষ্ণা! পিতাকে যে সেদিন সর্বসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছে সেই বালকের বীরত্বের জয়গান করতে হবে নাকি?

পাঞ্চালী অনুত্তেজিত কণ্ঠেই উত্তর দেয়।

—আমি মনে করি, উপযুক্ত শিষ্যের হাতে পরাজয়ে গুরুর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। সেদিনের বালক অর্জুনও পিতার শিষ্যতুল্য। তাঁর কাছে পরাজয়ে পিতার যশোহানি হওয়ার কথা সঙ্গত নয়। আর অসম্মানের কথা যদি বলো তো আমার মনে হয়, সেদিন পিতার অসম্মান যদি কেউ করে থাকেন তবে তিনি বালক অর্জুন নন, প্রৌঢ় দ্রোণাচার্য স্বয়ং। সেই অসম্মানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হলে তোমাকে তোমার অস্ত্রগুরুর বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করতে হবে। পাঞ্চালীর যুক্তি অকাট্য বলে মনে হয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভাবে, সত্যিই তো, অর্জুন নন, পিতার অপমানকারী দ্রোণাচার্য। অস্ত্রগুরু হলেও পিতার অসম্মানকারীকে ক্ষমা করা যায় না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে—ঠিক বলেছিস কৃষ্ণা। দ্রোণাচার্যকে বধ করে আমি পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেব।

খুশি হয় পাঞ্চালী কুমারের কথায়।

—সেটাই হবে তোমার মতো বীর পুত্রের যোগ্য কাজ।

সহোদরাকে লতাকুঞ্জের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্তঃপুরের পথ ধরে। নিভৃত কুঞ্জে বসে পাঞ্চালী ভাবতে থাকে পিতার পরাভবকারী বালক বীর অর্জুনের কথা। মনে হয় হৃদয় যদি কাউকে দিতে হয় তো তিনি অর্জুনই। এক অনাস্বাদিত পুলকের শিহরণ জাগে দেহে। অর্জুন! অর্জুন তাঁকেই সমর্পণ করবে বীরভোগ্যা দেহবল্লরী। কিন্তু কেমন করে পাবে সেই কৌমার-হর বরকে!

৪

মহারাজ্ঞী যুবতী কন্যার বিবাহ দিতে চান। সুযোগ বুঝে মহারাজ দ্রুপদকেও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সপ্তদশী কন্যার বিবাহ দেওয়ার সময় এসেছে। উদ্যোগী হওয়া দরকার। দ্রুপদ বলেন—ক্ষত্রিয়ের কন্যার স্বয়ংবরই বিধি। রূপেগুণে অতুলনীয়া কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থীর অভাব হবে না। কিন্তু অনেক চিন্তা করে দেখেছি অর্জুন ছাড়া আর কেউ কৃষ্ণার যোগ্য নয়।

স্বামীর কথায় মহারাজ্ঞী খুশি হন। বলেন আমিও চাই অর্জুনের হাতেই কৃষ্ণাকে তুলে দিতে।

দ্রুপদের মুখে বিষাদের ছায়া নামে। কণ্ঠে ফোটে কিছুটা হতাশা। বলেন—ইচ্ছা তো দুজনেরই, কিন্তু কোথায় পাব অর্জুনকে! লোকমুখে শোনা গেছে, বারণাবতে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন পঞ্চপাণ্ডব সহ কুন্তীদেবী। আমার অবশ্য বিশ্বাস হয় নি সে সংবাদ। তাই বিশ্বস্ত চর পাঠিয়েছি তাঁদের সন্ধানে। কিন্তু কেউই তো কোনো সংবাদ আনতে পারছে না!

—তাহলে কি হবে মহারাজ? আমার স্নেহের পুতুলী কি শেষ পর্যন্ত···

মহারাজ্ঞীর কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুপদ বলেন—না, না। তা হতে পারে না। একটা কিছু করতেই হবে যাতে কৃষ্ণা অপাত্রে না পড়ে। তুমি চিন্তা করো না, মহারাজ্ঞী। আমার মনে হচ্ছে, বিশেষ কারণেই পাণ্ডবেরা আত্মগোপন করে আছেন কোথাও। তাই ঠিক করেছি স্বয়ংবর সভায় এমন লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা করবো যাতে অর্জুন ছাড়া আর কেউ সফল হবে না। আর আমার বিশ্বাস কৃষ্ণার স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডবেরা নিশ্চয় যোগ দেবেন।

দেখতে দেখতে স্বয়ংবর সভার দিন এগিয়ে আসে। সভাগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়ে যায়। দেশে দেশে রাজপুত্রদের আমন্ত্রণপর্ব শেষ

হয়। দ্রুপদের নির্দেশে দক্ষ কারিগর দিয়ে তৈরি হয় এক বিশাল তুরানম্য ধনু আর একটি কৃত্রিম আকাশ যন্ত্র।

সভা অনুষ্ঠানের আগেই দ্রুপদ ঘোষণা করেন যে ব্যক্তি ঐ ধনুতে জ্যা আরোপ করে পাঁচটি শরে ঘূর্ণ্যমান আকাশ-যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন যাজ্ঞসেনী তাঁর গলায় বরমাল্য দেবে। দ্রুপদও তাঁকেই কন্যা সম্প্রদান করবেন।

বিচিত্র ধনু নির্মাণ আর আকাশ-যন্ত্র স্থাপনের খবর অন্তঃপুরেও পৌঁছে গেল। মন্দিরা সব দেখে এসে বললে—সখি, রাজ্যসুদ্ধ লোকের মুখে এক কথা : মহারাজ লক্ষ্যভেদের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই লক্ষ্যভেদের।

সখিকে তবু নিরুত্তর দেখে মন্দিরা আবার বলে—সখি, সব দেখেশুনে আমারও মনে হচ্ছে ভগবান তোমার মনোবাসনাই পূর্ণ করবেন। পাঞ্চালী ইতিমধ্যেই টের পেয়েছিল যে, মন্দিরা তার মনের কথা জেনে ফেলেছে। মন্দিরার মুখে বারবার অর্জুনের নাম শুনে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তবু মনোভাব গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই একটু ঔদাস্যের সুরে বললে—লোকে তো কত কথাই বলে। গোটা ভারতে কি অর্জুনের সমকক্ষ কেউ নেই! তাছাড়া একথাও তো শোনা গেছে যে, জননীসহ পঞ্চপাণ্ডব বারণাবতে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন!

মন্দিরা অপ্রস্তুত হয়। সত্যিই, আনন্দের আতিশয্যে বারণাবতের দুর্ঘটনার কথাটা খেয়াল ছিল না। তবু বলে—না, সখি, না। আমি বিশ্বাস করি না। দৈববলে যাঁরা বলীয়ান তাঁদের ঐভাবে মৃত্যু হতে পারে না। দেবতারা নিশ্চয় পাণ্ডবদের রক্ষা করেছেন।

মনে মনে একই প্রার্থনা জানায় পাঞ্চালী। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—ভগবানই জানেন তাঁরা এখন কোথায়।

৫

রাজধানীর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে প্রশান্ত সমতল ক্ষেত্রের মাঝখানে বিশাল মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। মণ্ডপের অদূরে দেখা যায় বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার সারি। বাইরে প্রাচীর, নিচে সুগভীর পরিখা। মণ্ডপের দ্বারে দ্বারে তোরণ। মাথার উপরে বিচিত্র কারুকার্যময় চন্দ্রাতপ। উৎকৃষ্ট অগুরুর সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। অট্টলিকাগুলি চন্দন জলে পরিষ্কৃত করে পুষ্পস্তবকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। শত বর্ণের প্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে সোনার ঝালরে ঢাকা মণিমাণিক্য খচিত বেদী, আসন, শয্যা ও পরিচ্ছদাদি। দেশ-দেশান্তর থেকে আমন্ত্রিত রাজপুত্রগণের সমাবেশে অট্টালিকাগুলি পরিপূর্ণ। নগরবাসীদের জন্য সভামণ্ডপের চারপাশে নির্মিত হয়েছে ক্রমোচ্চ মঞ্চ।

নানা দেশ থেকে অগণিত দর্শক সমাগমে পঞ্চাল রাজধানী জনারণ্যের রূপ ধারণ করেছে। এসেছে শত শত নট-নটী, নর্তক-নর্তকী, সূত, মাগধ। এসেছেন শত শত যাজক ও ব্রাহ্মণ। উদ্দেশ্য সমাগত রাজগণ প্রদত্ত বিবিধ ভোজ্য, অর্থ-গোধন প্রভৃতি গ্রহণ ও স্বয়ংবব অনুষ্ঠান দর্শন। পঞ্চপাণ্ডবও লোকমুখে স্বয়ংবর সভার কথা শুনে ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত হয়েছেন পঞ্চাল রাজধানীতে। সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে তাঁরাও আসন গ্রহণ করেছেন।

আনন্দানুষ্ঠান চলছে পক্ষ কাল ধরে। ব্রাহ্মণকে অজস্র ভোজ্য-পেয় সহকারে আপ্যায়িত করা হচ্ছে নিত্যদিন। নৃত্য-গীত-বাদ্যে সভামণ্ডপ মুখরিত। ষোড়শ দিনের প্রভাতে মহারাজ্ঞীর নির্দেশে পরিচারিকারা পূত বারিধারায় পাঞ্চালীকে অভিষিক্ত করে উত্তম বসন-ভূষণে সাজিয়ে দিলে। মন্দিরা অতি সন্তর্পণে তার হাতে তুলে দিলে সর্বজন ঈপ্সিত কাঞ্চনীমালা। কুল-পুরোহিত যথাসময়ে সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করে যথাবিধি অগ্নিতর্পণ ও স্বস্তিবাক্য পাঠ করলেন। মহারাজ দ্রুপদের আদেশে সমস্ত তূর্যধ্বনি স্তব্ধ হলো।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সহোদরাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন নীরব সভাস্থলে। জলদগম্ভীর স্বরে ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে উঠলেন :

—হে সমবেত নৃপবৃন্দ, আপনারা অবহিত হোন। ঐ দেখুন ভূমিতে রয়েছে পঞ্চবাণ সহ সুদৃশ্য ধনু আর ঊর্ধ্বদেশে দেখুন আকাশ-যন্ত্রের উপরে রাখা লক্ষ্যবস্তু। ঐ যন্ত্রের ছিদ্রপথে পঞ্চশর নিক্ষেপ করে উচ্চকুলসম্ভূত, রূপবান, পরাক্রমশালী যে ব্যক্তি ঐ লক্ষ্যবস্তু ভূপাতিত করতে সক্ষম হবেন আমার এই সুলক্ষণা ও সর্বগুণসম্পন্না ভগিনী অবশ্যই তাঁর ভার্যা হবেন।

ঘোষণা শেষ করে পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন ভগিনী, সমাগত রাজবৃন্দের মধ্যে ঐ দেখ, দুর্যোধন-দুঃশাসন প্রমুখ কৌরব রাজপুত্রগণ আর অঙ্গরাজ কর্ণ সমাসীন। দেখ, গান্ধার, মদ্র, কাম্বোজ, পুরু, কোশল, কাশী, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, ভোজ প্রভৃতি রাজপুত্রগণকে। দেখ, অন্ধক, ও বৃষ্ণি বংশের রাজপুত্রগণ সহ উপবিষ্ট বলরাম ও কৃষ্ণকে। এই অসংখ্য রাজা ও রাজপুত্রগণের মধ্যে যিনি লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হবেন তুমি তাঁকেই আজ বরণ করো।

পাঞ্চালী সভাস্থলে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন তাঁর অপরূপ বরতনুর দিকে। রূপের নেশায় তাঁদের স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো কামনার অগ্নিশিখা। পাঞ্চালীকে লাভ করতে পারলে জীবন সার্থক হবে এই ভেবে সকলেই লক্ষ্যভেদের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

জ্যেষ্ঠের পরিচয় দেওয়ার সময় পাঞ্চালী সমাগত সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিল। যার দিকে তাকায় তিনি মনে করেন দ্রুপদ-নন্দিনী বোধহয় তাঁর প্রতি আকৃষ্টা। দুর্যোধন, দুঃশাসন, জরাসন্ধ, শিশুপাল, কর্ণ থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে উপবিষ্ট পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত সকলেই মনে মনে কামনা করলে অনিন্দযৌবনা পাঞ্চালীকে। যাদবশ্রেষ্ঠ বলরামও রূপমুগ্ধ। কিন্তু ধনুর্বিদ্যায় নিজের অপারদর্শিতার কথা চিন্তা করে কৃষ্ণকে ইঙ্গিত করলেন লক্ষ্যভেদের জন্য প্রস্তুত হতে। কৃষ্ণও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন

পাঞ্চালীকে। শুধু রূপই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর চোখে পড়লো বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত মুখখানি। সম্মোহিতের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণ। চকিতে নিজের প্রিয় ভার্যা রুক্মিণী, সত্যভামার কথা মনে হলো। তাঁরাও রূপবতী, গুণবতী। কিন্তু পাঞ্চালী অনন্যা। পরক্ষণেই অগ্রজের দৃষ্টি অনুভব করে নিজেকে সংযত করে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন—ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ একমাত্র অর্জুনেরই শোভা পায়। আর্যা কুন্তীর পুত্র সে। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমার অভিপ্রেত নয়।

একটু বিরক্ত হয়ে বলরাম বললেন—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কোথায় অর্জুন। তারা কি বেঁচে আছে ?

কৃষ্ণের মুখে রহস্যময় হাসি। কণ্ঠে দৃঢ়তা।

—আমি ঐ বারণাবতের কাহিনী বিশ্বাস করি না। আশা করছি এই সভাতেই তাঁদের দেখতে পাব।

কথা বলতে বলতেই কৃষ্ণ সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে বারবার দৃষ্টিক্ষেপ করেন।

ইতিমধ্যে দুর্যোধন ও আরও কয়েকজন রাজপুত্র এগিয়ে গেছেন লক্ষ্যভেদ করার আশায়। কিন্তু শর নিক্ষেপ দূরের কথা, সেই গুরুভার ধনু ধারণও করতে পারলেন না কেউ। তখন এগিয়ে গেলেন মগধরাজ জরাসন্ধ। সদর্পে ধনু তোলবার চেষ্টা করতেই ভীষণ ধাক্কায় ধরাশায়ী হলেন। বস্ত্র অলংকার ছিন্নভিন্ন। ধূলিধূসরিত শরীরে কোনরকমে ফিরে গেলেন নিজের আসনে। উঠলেন চেদীরাজ শিশুপাল। মদ্ররাজ শল্য প্রমুখ পরাক্রান্ত বীর নৃপতিবৃন্দ। কিন্তু ধনু তুলতে না পেরে সকলেই অপ্রতিভ হয়ে ফিরে গেলেন।

সভাস্থলে তখন এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলো। চাপা উত্তেজনা দেখা দিল রাজপুত্রদের চোখে-মুখে। কেউ কেউ অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ আমাদের অপদস্থ করার জন্যই ঐ অনম্য ধনুতে জ্যা আরোপণের শর্ত রেখেছেন। আমাদের উচিত তাঁকে এজন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া।

রাজপুত্রদের দুরবস্থা দেখে পাঞ্চালীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অঙ্গরাজ কর্ণ। তাঁকে ধনুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখে সকলে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কর্ণের দুর্দশা দেখার আশায়। কর্ণ কোনো দিকে না তাকিয়ে ধনুর কাছে গিয়ে এক নিমেষে তুলে নিলেন ধনু আর পঞ্চ শর। তারপর ধনুতে জ্যা আরোপণ করে শর নিক্ষেপে উদ্যত হতেই একশব্দ-বাণ যেন তাঁরই মর্মস্থলে বিদ্ধ করলে।

—সূতপুত্রকে আমি বরণ করবো না।

কর্ণকে শর সন্ধান করতে দেখে সকলেই রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাকিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আসনগ্রহণকারী পঞ্চপাণ্ডবও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন কর্ণের আশু জয়ের সম্ভাবনায়। অর্জুন এতক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে দেখছিলেন পাঞ্চালীকে বিস্ময়, অনুরাগ আর কামনায় পরিপ্লুত দৃষ্টিতে। যুধিষ্ঠিরের অস্ফুট স্বরে কর্ণের দিকে তাকালেন অর্জুন। বুঝতে দেরি হলো না যে, ধনুর্বিদ্যায় তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ অবিলম্বে লক্ষ্যভেদ কর-বেন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অর্জুনও তাকালেন লক্ষ্য বস্তুর দিকে।

কিন্তু কর্ণের বৃদ্ধাঙ্গুলি শিথিল হয়ে গেল দ্রুপদকন্যার নির্মম শাণিত উদ্ধত প্রত্যাখ্যানে। ধনু ভূতলে নামিয়ে চকিতের জন্য পাঞ্চালীর দিকে তাকালেন কর্ণ। সেই অনুরাগ ভরা ব্যথাসিক্ত দৃষ্টি স্পর্শও করলো না পাঞ্চালীকে। আকুল দৃষ্টিতে সে তখনো খুঁজছে তাকে—যার গলায় বর-মাল্য দেওয়ার জন্য সে উন্মুখ, অধীর। কিন্তু কোথায় সেই অর্জুন! সে দৃষ্টিতে অর্জুন ছাড়া আর সবাই তখন সূতপুত্র!

সাফল্যের সূচনায় কর্ণের রূঢ় প্রত্যাখ্যানে ইতিপূর্বে অপ্রতিভ রাজপুত্রগণ রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন দ্রুপদকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে। দ্রুপদও পরিস্থিতি দেখে শঙ্কিত হলেন অমঙ্গলের আশঙ্কায়।

হঠাৎ ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে একটা চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করে সকলের দৃষ্টি পড়লো সেদিকে। এক যুবাকে দৃঢ় পায়ে ধনুর দিকে অগ্রসর হতে দেখে

ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন—ওহে মূঢ় যুবক, রূপমোহে বিভ্রান্ত হয়ে অসাধ্য সাধন করতে যেও না। এখনি নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও। নিজের নিবুর্দ্ধিতায় ব্রাহ্মণদের হাস্যাস্পদ করে তুলো না।

ব্রাহ্মণদের কথা অগ্রাহ্য করে যুবক এগিয়ে যাচ্ছে দেখে রাজপুত্রগণও বলে উঠলেন—কি পরিহাসের ঘটনা। শেষ পর্যন্ত ঐ ব্রাহ্মণ যুবক লক্ষ্য-ভেদ করতে অগ্রসর হলো! একেই বলে রূপের মোহ!

শাণিত তরবারির মতো ঋজুদেহী যুবক ততক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ধনুর সামনে। মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর দ্রুতপায়ে ধনু প্রদক্ষিণ আর ইষ্ট স্মরণ করে ক্ষিপ্রহস্তে ধনু তুলে শরযোজনা করলেন। পর পর পঞ্চবাণ বিদ্ধ লক্ষ্যবস্তু এসে পড়লো মাটিতে। সেই অভাবনীয় সাফল্যে ব্রাহ্মণকুল সহর্ষে জয়ধ্বনি দিলেন নিজেদের। সভাস্থলে আবার উত্তেজনা দেখা দিল। রাজপুত্রগণ ব্যঙ্গোক্তি করলেন ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে। তারপর শুরু হলো দ্রুপদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত আস্ফালন। চমৎকৃত হলেন দ্রুপদ ব্রাহ্মণ যুবকের পারদর্শিতায়। মনে অসীম কৌতূহল। কে এই যুবক! কোনোও ব্রাহ্মণের সাধ্য নেই এই লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার। তবে কি তাঁর এতদিনের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। সফল হয়েছে লক্ষ্যভেদ পরিকল্পনা! ব্রাহ্মণ কি সত্যই ছদ্মবেশী অর্জুন! কিন্তু ঘটনা তখন এত দ্রুত ঘটে চলেছে যে সুস্থির হয়ে কিছু চিন্তা করারও অবকাশ নেই। দ্রুপদ তাই নিজ সৈন্যদলকে প্রস্তুত রাখলেন লক্ষ্যভেদী ব্রাহ্মণ যুবকের রক্ষাকল্পে।

৬

বিদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা।
পার্থঞ্চ শক্র প্রতিমং নিরীক্ষ্য ॥
স্বভ্যস্তরূপাপি নরেব নিত্যং।
বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা ॥
মদাদৃতেঽপি স্খলতীব জাইব-
বার্চা বিনা ব্যাহরতীব দৃষ্ট্যা ॥

ব্রাহ্মণবেশী যুবককে লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে দেখে পাঞ্চালী স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল তাকে। লক্ষ্যবস্তু ভূপাতিত হলো। যেন এক দুর্বার আকর্ষণে পাঞ্চালী এগিয়ে গেল বরমাল্য নিয়ে। যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে কুমারী-হৃদয় বুঝি কেঁপে উঠলো। শুভদৃষ্টি বিনিময়ক্ষণে মন বললে যাকে সে মনে-প্রাণে কামনা করেছে, যার জন্য বীরাগ্রগণ্য কর্ণকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে—এই ব্রাহ্মণ যুবক বুঝি সেই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

সমবেত দর্শক-দৃষ্টিতে পাঞ্চালী যেন অপরূপা সদৃশ। অধরে হাসি না ফুটলেও হাস্যময়ী। মত্ততাশূন্য এক আনন্দের ভাবাবেশে সারা অঙ্গ যেন স্খলিত। কত কথাই তরঙ্গিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

স্মিতমুখী প্রিয়তমকে আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে সর্বসমক্ষে হাতের বরমাল্য-খানি তুলে দিলে অর্জুনের কণ্ঠে। উৎফুল্ল অর্জুনের অনুরাগভরা দৃষ্টি-বিনিময়ে চিত্ত নিঃশঙ্ক হলো কুমারী কৃষ্ণার।

দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে রাজন্যবর্গ ততক্ষণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। অর্জুন পাঞ্চালীকে নিয়ে সভাস্থল ত্যাগে উদ্যত হতেই তাঁরা সরবে বাধা দিলেন। বিপদের সম্ভাবনায় দ্রুপদও সসৈন্যে প্রস্তুত হলেন

পরিস্থিতির জটিলতায় অপ্রস্তুত অর্জুন একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এমন সময় সমবেত ব্রাহ্মণগণ ভীমসেনকে পুরোভাগে নিয়ে দৃঢ় প্রতিবাদ জানালেন রাজপুত্রদের অন্যায় আচরণের। ভীমসেনকে সামনে দেখে অর্জুন আশ্বস্ত হয়ে প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্য। আক্রমণোদ্যত রাজন্য-বর্গ মুহুর্মুহু শরবর্ষণ শুরু করলেন অভ্যস্তহস্তে। ভীমসেনও নিষ্ক্রিয় রইলেন না। সভামণ্ডপের বাইরে থেকে একটা বৃক্ষশাখা ভেঙে নিয়ে গদার মতো ব্যবহার সুরু করলেন শত্রুদের লক্ষ্য করে।

রাজন্যবর্গের পুরোভাগে ছিলেন কর্ণ। ব্রাহ্মণ যুবককে অবলীলাক্রমে লক্ষ্যভেদ করতে দেখে তার প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হন। এখন অব্যর্থ লক্ষ্যসন্ধানী অর্জুনের মতো ক্ষিপ্রহস্তে শরবর্ষণ করতে দেখে স্বয়ং অর্জুনই যে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ যুবক সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হলেন। তাই লক্ষ্যভেদী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁর কোনো উৎসাহ রইলো না। বিধাতা যাঁর প্রতি প্রসন্ন, বরমাল্যরূপিণী কৃষ্ণা স্বেচ্ছায় যাঁর কণ্ঠলগ্না তাঁর সঙ্গে নিছক ঈর্ষাবশে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক ভেবে কর্ণ স্বয়ংবর সভা ত্যাগ করলেন।

মদ্ররাজ শল্য অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

স্বয়ংবর সভা অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে দেখে বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণ এগিয়ে এলেন মীমাংসার প্রয়াসে। ব্রাহ্মণ যুবকের পক্ষ অবলম্বন করে যুযুধান রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে নিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় অপমানের প্রতিকার হয়েছে মনে করেই শল্য প্রমুখ রাজারা সভাস্থল ত্যাগ করলেন।

পাঞ্চালী এতক্ষণ সতর্ক দৃষ্টিতে দুই ব্রাহ্মণ যুবকের প্রচণ্ড বিক্রমে আক্র-মণকারীদের প্রতিহত করার প্রয়াস লক্ষ্য করছিল। একজনের অব্যর্থ শর-সন্ধান, আর একজনের মল্লকৌশল দেখে মনে হয় যে, সে অনাকাঙ্ক্ষিতকে মাল্যদান করে নি। স্বয়ং অর্জুনই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বরণ করেছেন তাকে। তবু নিঃসংশয় হতে পারে না। পঞ্চপাণ্ডব একসঙ্গেই বিচরণ

করেন বলেই তো শোনা গেছে। তাহলে আর তিন পাণ্ডবকে দেখা গেল না কেন ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সভাস্থল শান্ত হলো। ভীম-অর্জুন তখন পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। তাঁদের পিছু নিলেন বিজয়-গর্বে উৎফুল্ল ব্রাহ্মণ যুবার দল।

৭

গত্বা তু তাং ভার্গবস্য কর্মশালাং পার্থৌ পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ।
তাং যাজ্ঞসেনীং পরম প্রতীতৌ ভিক্ষেত্যথাবেদয়তাং নরাগ্র্যৌ ॥
কুটীগতা সাত্বনবেক্ষ পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙ্‌ক্তেতি সমেতসর্বে।
পশ্চাচ্চ কুন্তী প্রসমীক্ষ কৃষ্ণাং কষ্টং ময়াভাষিতমিত্যুবাচ ॥

নগরপ্রান্তে কুম্ভকারের পর্ণকুটির। সদলে কুটিরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ভীম-অর্জুন সবিনয়ে ব্রাহ্মণ যুবকদের বিদায় দিলেন। তারপর সানন্দে দ্রৌপদীর বিষয় উল্লেখ করে কুন্তীদেবীর উদ্দেশে বললেন—জননী, ভিক্ষা এনেছি। এতক্ষণ যেন ঐ আহ্বানেরই প্রতীক্ষা করছিলেন কুন্তীদেবী। যুধিষ্ঠিরের মুখে স্বয়ংবর সভার সব বৃত্তান্ত ইতিমধ্যেই শুনেছিলেন। দ্বার অর্গলমুক্ত করার মুহূর্তে ভিক্ষা আনার কথা শোনামাত্র অভ্যাসবশেই বলে ফেললেন —সকলে সমভাবে ভোগ কর।

কুটিরে সর্বাগ্রে ভীম প্রবেশ করলেন। তারপর অর্জুন। দু'জনে নতজানু হয়ে জননীর চরণবন্দনা করলেন। কুন্তীদেবী তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করে সস্নেহে বললেন—দীর্ঘজীবি হও।

পুত্রেরা একপাশে সরে দাঁড়াতেই কুন্তীদেবীর চোখ পড়লো নতমুখী পাঞ্চালীর প্রতি। পরম সমাদরে দ্রুপদ-কন্যাকে কাছে টেনে নিয়ে মস্তক

আঘ্রাণ করে বললেন—বৎস, কল্যাণ হোক তোমার। চিরায়ুষ্মতী হও। ভরতবংশের গৌরববৃদ্ধি হোক তোমার সৌভাগ্যে।

পাঞ্চালী শশ্রূমাতার চরণবন্দনা করলে। সস্নেহে তার চিবুক স্পর্শ করে পাণ্ডবজননী আবার বললেন—ভদ্রে, পতিসোহাগিনী হও। সাধ্বী পত্নী রূপে বীর পুত্রের জননী হও।

তারপর আহ্বান করলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে।

জননীর আহ্বানে যুধিষ্ঠির এসে দাঁড়ালেন। এলেন নকুল ও সহদেব।

ভীমসেনের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন—বৃকোদর, তোমাদের বিলম্বের কারণ কি?

ভীম বললেন—লক্ষ্যভেদের পর যথাসময়েই পাঞ্চালী অর্জুনের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সভাস্থল থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পথে কর্ণের নেতৃত্বে সমবেত রাজপুত্রেরা বাধা সৃষ্টি করেন। বাধ্য হয়ে অর্জুনকে অস্ত্রধারণ করতে হয়। ভীমও তার সহায়তা করেন। দু'জনের আক্রমণে শত্রুপক্ষ পর্যুদস্ত হয়ে পড়লেও বাধাদানে নিবৃত্ত হয় না। শেষপর্যন্ত কৃষ্ণ-বলরামের মধ্যস্থতায় তাঁরা ক্ষান্ত হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

অর্জুন এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন। ভীমের কথা শেষ হতে তিনি বললেন—লক্ষ্যভেদ করে আমি দ্রৌপদীকে লাভ করেছি সত্য কিন্তু জননী আমাদের সকলকে সমানভাবে ভোগ করার আদেশ করেছেন। সুতরাং পাঞ্চালী ধর্মতঃ আমাদের সকলেরই ভার্যারূপে গ্রহণীয়া।

৮

মিষ্ণোর্বচত্রমাজ্ঞায় ভক্তিস্নেহ সমন্বিতম্।
দৃষ্টিংনিবেশয়ামাসু পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
দৃষ্ট্বা তে তত্র পশ্যন্তী সর্বে কৃষ্ণাং যশস্বিনীম্।
সম্প্রেখ্যান্যোন্যমাসীনা হৃদয়ৈ স্বামধারয়ন্।
তেষাস্তু দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা সর্বেষামমিতৌজসাম্।
সম্প্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসীন্মনোভবঃ ॥
কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রাবিহিতং স্বয়ম্।
বভুবাধিকমন্যাভ্যঃ সর্বভূতমনোহরম্ ॥

অর্জুনের কথায় যুধিষ্ঠির যেমন বিস্মিত হলেন তেমনই আনন্দও অনুভব করলেন মনে মনে। দূর থেকে যাকে দেখামাত্র মোহিত হয়েছিলেন একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেও মায়ের উপস্থিতিতে লজ্জাবশে এতক্ষণ তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নি। অর্জুন যেন সেই সুযোগ এনে দিলেন।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই দ্রৌপদীর মুখের পানে তাকালেন। দ্রৌপদীর দৃষ্টির সঙ্গে সকলের দৃষ্টি বিনিময় হলো। নিজেদের প্রতি দ্রৌপদীর দৃষ্টি অনুভব করে সকলেই মনে মনে বরণ করলেন তাকে।

শ্যামাঙ্গী পাঞ্চালীর রূপলাবণ্যের দিকে পঞ্চপাণ্ডব সম্মোহিতের মতো সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন। সকলের চোখেই কামনার শিখা স্বয়ংবরা পাঞ্চালীর সঙ্গে কুন্তীদেবীরও দৃষ্টি এড়াল না।

কুন্তীদেবীর মনে পড়লো দ্বারপ্রান্তে প্রথম পাঞ্চালীকে দেখে তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কি অনবদ্য শোভা ঐ শ্যামাঙ্গে। এত

লাবণ্য, এমন বুদ্ধিদীপ্ত অথচ কামোদ্রেককারী নয়ন, রক্তাভ ওষ্ঠাধর আর কোনো রমণীর আছে বলে মনে হয় নি।

সংযত স্বভাব পুত্রদের রূপবিহ্বলতা, কামোত্তেজনার কারণ তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন এই মুহূর্তে। পুত্রদের সেই দৃষ্টির সামনে পাঞ্চালীকে যেন শঙ্কিত বলেও মনে হলো তাঁর।

চিন্তায় ভ্রূ কুঞ্চিত হলো কুন্তীদেবীর। মনে হলো পাবকশিখারূপিণী এই যুবতী ন্যায়তঃ অর্জুন লব্ধা হলেও তাঁর মুখনিঃসৃত আদেশের ব্যতয় ঘটলে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কারণ হতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তে বেশি চিন্তার আর অবকাশ হলো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বলরাম ও কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন কুটিরে। বলরাম কুন্তী-দেবীকে প্রণাম করে পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ প্রণাম করলেন কুন্তীদেবী ও যুধিষ্ঠিরকে। কথাপ্রসঙ্গে বলরাম অর্জুনের সাহস ও বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কুশলবিনিময় শেষ হতে যুধিষ্ঠির বললেন—বাসুদেব, তোমরা আমাদের সন্ধান পেলে কি করে?

কৃষ্ণ মৃদু হাসলেন।

—মহারাজ, স্বয়ংবর সভায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে আপনাদের দেখেই আমি চিনেছি। বহ্নি ভস্মে ঢাকা থাকে না। কিন্তু একটা কথা বলি। সকলেই সংশয়াপন্ন, বিশেষ করে কর্ণ। খুব সাবধানে থাকবেন আপনারা।

পঞ্চপাণ্ডবের কাছ থেকে উঠে কুন্তীদেবীর সঙ্গে নিভৃতে কিছু কথা বলে বিদায় নিলেন কৃষ্ণ ও বলরাম।

এদিকে দ্রুপদের নির্দেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন একদল পার্শ্বচর নিয়ে গোপনে পাণ্ডবদের অনুসরণ করছিল। সব দেখে শুনে দ্রুপদকে গিয়ে বললেন—মহারাজ, আমার ধারণা ওঁরা শুধু ক্ষত্রিয় নন, পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া আর কেউ নন।

মনের আশা পূর্ণ হতে চলেছে ভেবে দ্রুপদ মহা আনন্দে পুরোহিতকে নির্দেশ দিলেন পরদিন পাণ্ডবদের জননী কুন্তীদেবীব কাছে কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাব জানাতে।

ভিক্ষান্ন রন্ধন শেষ হতে পাঁচভাই আহার্য গ্রহণ করলেন। তারপর কৃষ্ণাকে

নিয়ে কুন্তীদেবী রাতের আহার শেষ করলেন। সহদেব ফুলশয্যা পাতলেন ভূমিতে। কুন্তীদেবী তাঁদের মাথার দিকে আর পাঞ্চালী পায়ের দিকে শুয়ে পড়লেন।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। সবাই গাঢ় ঘুমে মগ্ন। শুধু কুন্তীদেবীর চোখে ঘুম নেই। শত বাধাবিপদেরমধ্যেও রাত্রির নিদ্রার কোনো দিন ব্যাঘাত ঘটে না তাঁর। আজ পরম আনন্দের দিন হলেও একটা অজানা আশঙ্কায় চোখে ঘুম নেই। মনে হলো স্বয়ংবর সভায় পুত্রদের যেতে না দিলেই বোধহয় ভালো হতো। তাহলে আর এই দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ঘটতো না। কিন্তু এখন সেকথা ভেবেই বা কি হবে। যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে।

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেছে ঠিকই কিন্তু ভীম সহায় না হলে বিরোধী রাজাদের হাত থেকে পাঞ্চালীকে উদ্ধার করা অর্জুনের পক্ষেও সহজ হতো না। তাছাড়া একথাও সত্য যে, পাঁচভাই পাঞ্চালীর রূপমুগ্ধ। সমানভাবে কামনা করে তাকে। তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, সুখ-দুঃখে সমান নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির পর্যন্ত দ্রুপদ কন্যাকে দেখে অতটা বিহ্বল হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় শুধু অর্জুনের হাতে কি করে তুলে দেবেন তাকে!

পরদিন প্রভাতে দ্রুপদরাজার কুল-পুরোহিত এলেন কুন্তীদেবীর কাছে। উপযুক্ত পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করে বললেন—পাণ্ডবদের বারণাবত থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসার সংবাদে মহারাজ দ্রুপদ অতীব আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর একান্ত অনুরোধ স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদী অর্জুন পাঞ্চালীকে ধর্মানুসারে গ্রহণ করুন। কুন্তীদেবীর নির্দেশে যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

পুরোহিতকে বিদায় জানিয়ে ভায়েদের প্রতিদিনের মতো ভিক্ষায় পাঠিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির নিজে গিয়ে বসলেন পূজারতা জননীর কাছে। পূজা শেষ করে ইষ্টদেবের উদ্দেশে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন কুন্তীদেবী। উঠে দাঁড়াতেই যুধিষ্ঠিরের আনত মাথা তাঁর পাদস্পর্শ করলো। আশীর্বাদ জানিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন তাঁর পাশে বসতে। তারপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীর স্বরে বললেন—দেখ বাবা, কাল সারা রাত

আমি তোমাদের সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেছি। আজ ইষ্টদেবের কাছেও আকুল হয়ে পথনির্দেশ কামনা করলাম এতক্ষণ। আমার মন বলছে, পাঞ্চালীকে ভার্যারূপে পাওয়ার জন্য তোমরা সমভাবেই উতলা হয়েছ। এই অবস্থায় শুধু অর্জুনই নয়, তোমাদের সকলেরই তাঁকে ভার্যারূপে গ্রহণ করা সঙ্গত বলে মনে করি।

মায়ের মুখে এই সুস্পষ্ট উক্তি প্রত্যাশা করেন নি যুধিষ্ঠির। লজ্জায় অধোবদন হলেন মায়ের কাছে নিজের গোপন আকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে বুঝে। মুহূর্তের দুর্বলতায় মনের সব সংযম হারানোর জন্য মনে মনে ধিক্কার দিলেন নিজেকে। তারপর ধীর অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন—জননী, তা কি করে সম্ভব ! অর্জুনই লক্ষ্যভেদ করে পাঞ্চালীকে ধর্মতঃ লাভ করেছেন। তাছাড়া সাধ্বী স্ত্রীলোকের বহু পতিত্ব লোকাচার বিরুদ্ধ। আমরা কেমন করে সেই নিন্দনীয় কাজ করবো ? আমাদের দুর্বলতা আপনি ক্ষমা করুন। অর্জুনই গ্রহণ করুন দ্রুপদ-নন্দিনীকে।

সস্নেহে যুধিষ্ঠিরের মাথায় হাত রেখে কুন্তীদেবী বললেন—বাছা, আমি তোমাদের কোনো দোষ দেখি না। পাঞ্চালী রূপে-গুণে অনন্যা। এমন নারীরত্ন আমি আর দেখি নি। তাঁকে দেখলে স্ত্রীলোক পর্যন্ত বিহ্বল হবে। তোমরা শুধুমাত্র পুরুষই নও, নব যৌবনের অধিকারী। যৌবনধর্মে যা স্বাভাবিক তা-ই ঘটেছে। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, প্রচলিত লোকাচারকে দুর্লঙ্ঘ্য ভেবে আমি যৌবনধর্মকে যদি অস্বীকার করি তাহলে তা হবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। তার অবশ্যম্ভাবী ফল বিষময় ভ্রাতৃবিদ্বেষ ও বিরোধ। তোমরা জৈব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যেতে পারবে না। তাই আমি আদেশ করছি, আগামীকাল শুভক্ষণে তোমরা পাঁচভাই তাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করো।

যুধিষ্ঠির তবু বললেন—জননীর আদেশ আমাদের শিরোধার্য। তবু বলছি যে, এই বিবাহে পাঞ্চালীরও সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো কুন্তীর।

—এখন আর অন্য কারোও সম্মতির প্রয়োজন দেখি না। সম্মতি চাইলে

সকলেই অসম্মতি জানাবে। হ্যাঁ পুত্র, আমি জানি মহারাজ দ্রুপদও প্রথমে অসম্মত হবেন। কাল কৃষ্ণের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। সে আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। তোমার উপর দায়িত্ব দিলাম কাল যেভাবে পার মহারাজ দ্রুপদকে সম্মত করে যথাবিধি সকলে তাঁর যজ্ঞসম্ভূতা কন্যাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করবে। আমি যথাসময়ে উপস্থিত হব।

৯

সূর্যোদয়ের পরেই পাঞ্চাল রাজভবন থেকে নানা রত্নালংকার সাজানো রথ আর একটি শিবিকা এসে দাঁড়াল কুম্ভকারের কুটিরের সামনে। পঞ্চপাণ্ডব রথে উঠলেন ব্রাহ্মণবেশে। যাজ্ঞসেনী শিবিকায়। শিবিকা আর সারিবদ্ধ পাঁচটি রথের পেছনে চললো অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য।

রাজভবনের দ্বারে দ্রুপদ মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন পঞ্চপাণ্ডবকে। মহারাজ্ঞী কন্যাকে নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে। কুশল বিনিময়ের পর মহারাজ দ্রুপদ জানালেন সম্প্রদানের সব আয়োজন প্রস্তুত। লগ্নও উপস্থিত। যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করলেন অর্জুনকে ভার্যাগ্রহণে অনুমতি দেওয়ার জন্য। যুধিষ্ঠির বিনীত কণ্ঠে মায়ের আদেশ শোনালেন দ্রুপদ রাজাকে। সেই সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের এক ভার্যাগ্রহণের সিদ্ধান্তও প্রকাশ করলেন।

যুধিষ্ঠিরের কথায় দ্রুপদ বিমূঢ়। অনেকক্ষণ অনেক যুক্তিতর্কে যুধিষ্ঠিরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। একথাও বললেন যে, বেদবিরুদ্ধ, লোকাচারবিরুদ্ধ ঐ প্রস্তাবের পরিবর্তে বরং জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব স্বয়ং পাঞ্চালীর পাণিগ্রহণ করুন অথবা অন্য যে কোনো ভ্রাতাকে অনুমতি দিন। কিন্তু মায়ের আদেশ ছাড়া অন্য কোনো কথাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন না যুধিষ্ঠির।

দ্রুপদ পড়লেন মহা বিপাকে। এদিকে লগ্ন উত্তীর্ণ হতে চলেছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঠালেন কুন্তীদেবীকে নিয়ে আসার জন্য।
মহারাজ স্বয়ং পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে সমাদর করলেন পাণ্ডব-জননীকে। তারপর সকাতরে অনুরোধ জানালেন কোনো এক পুত্রকে আদেশ দিতে পাঞ্চালীকে ভার্যারূপে গ্রহণের জন্য। কুন্তীদেবী প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। খোলা-খুলি বললেন—পঞ্চপুত্রের কল্যাণ তথা ভরতবংশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমি আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ মনে হলেও এই সুপ্রাচীন কৌম-রীতিই অনুসরণ করতে চাই।
কুন্তীর অভিমত শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহারাজ্ঞী। দ্রুপদ বসে রইলেন হতবাক হয়ে। ধৃষ্টদ্যুম্ন শেষ চেষ্টা হিসাবে অর্জুনের শরণাপন্ন হলেন। অর্জুন নীরবে শুনলেন ধৃষ্টদ্যুম্নের সব কথা। তিনিও বিমূঢ়। একথা ভাবতেও পারেন নি যে লক্ষ্যভেদের মতো সুকঠিন পরীক্ষার পরেও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে আর এক কঠিনতর পরীক্ষা। হয় হৃদয়-বাসনা পূরণ, না হয় কৌমরীতির কাছে আত্মসমর্পণ—এ'দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে! স্বয়ংবর সভায় বরমাল্য দেওয়ার সময় পাঞ্চালীর অনুরাগভরা আত্মনিবেদনের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অর্জুন ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ভাবেন, ভায়েদের কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষা করে নেবেন পাঞ্চালীকে। সেই অপরাধের জন্য সব শাস্তি মাথা পেতে নেবেন। কিন্তু আবার মনে হয়, তা হয় না। স্বার্থপরের মতো তিনি শুধু নিজের কথাই ভাবছেন। তাঁরমতো অন্য ভায়েরাও তো দ্রুপদনন্দিনীকে লাভের জন্য ব্যাকুল। তাঁরাও কামনা করেন সেই বরাননাকে। লোকাচারের দোহাই দিয়ে সেই সম্মিলিত কামনা-বহ্নি কে নেভাবে! মনে হয়, এই হয়তো বিধিলিপি তাঁর।
প্রথমে যুধিষ্ঠির, তারপর কুন্তীদেবীর সুদৃঢ় অভিমত শোনা সত্ত্বেও পাঞ্চালীর অন্তরে আশার যে ক্ষীণশিখাটি তখনো জ্বলছিল সেটি হলো অর্জুনের ব্যক্তিত্বের প্রতি অকম্পিত বিশ্বাস। ভেবেছিল পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন নিশ্চয় কৌম রীতি অগ্রাহ্য করে একাই তার পাণিগ্রহণ করবেন। কিন্তু

ধৃষ্টদ্যুম্ন এসে শেষ দুঃসংবাদ জানিয়ে দিলেন—পাঞ্চালী পঞ্চভর্তা হবেন জেনেও কোনো প্রতিবাদ করেন নি অর্জুন।

কামনার ঝঞ্ঝায় আশার ক্ষীণশিখা নিভে গেল। নারীত্বের চরম অপমানের গ্লানিতে ভরে গেল অন্তরাত্মা। রুদ্ধ আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠলো পাঞ্চালী। কৌম রীতির কাছে নতিস্বীকার করে নারীধর্মকে অবজ্ঞা করতে একটু দ্বিধাও হলো না অর্জুনের! এক কথায় তুচ্ছ করে দিলেন তার কৌমার্যকে!

পুরোহিত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন লগ্ন অতিক্রান্ত হয় এই আশঙ্কায়। ব্যথিত দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঠালেন ভগিনীকে সব বুঝিয়ে পারিবারিক সম্মান রক্ষার জন্য সম্প্রদান স্থলে নিয়ে আসার জন্য। অগ্রজকে নীরবে নতমুখে এসে দাঁড়াতে দেখে সহোদরা বুঝতে পারলে সবই। মনে তখন ঝড় বইছে দুরন্ত গতিতে। একদিকে তার নারীত্ব, ভালবাসা, আর একদিকে অন্ধ কৌম রীতি। বড় নিষ্ঠুর মনে হলো অর্জুনকে। কিন্তু অর্জুন যাই করুন, নিজের ভালবাসাকে তো সে মুছে ফেলতে পারে না হৃদয় থেকে। অর্জুনকে ভালবাসে বলেই শেষ পর্যন্ত নিজের সর্বনাশকেই বরণ করে নিলে। অগ্নিতে আহুতি দিয়ে একের পর এক পাঁচ ভাই দ্রুপদবালার পাণিগ্রহণ করতে বসে গেলেন।

কন্যার মুখের দিকে তাকানোর সাহস হলো না দ্রুপদের। কোনও রকমে পাঁচবার কন্যা সম্প্রদান করলেন যন্ত্রের মতো।

পঞ্চাল রাজধানীতে পাণ্ডবদের মহাসুখেই দিন কাটছিল।

একদিন হঠাৎ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ এলো হস্তিনাপুরে যাওয়ার জন্য। যুধিষ্ঠির সবাইকে নিয়ে ফিরে গেলেন হস্তিনাপুর; কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হতেই দুর্যোধনের কুপরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র-ভীষ্ম-বিদুরের নিষেধ সত্ত্বেও অর্ধেক রাজত্ব দেওয়ার অছিলায় পাণ্ডবদের খাণ্ডববনে নির্বাসনের ব্যবস্থা করলেন।

অর্ধেক রাজত্বের পরিবর্তে এক নিবিড় অরণ্যানীতে কিভাবে রাজত্ব করা সম্ভব তা বুঝতে পারলেন না পঞ্চপাণ্ডব। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শ চাই-লেন। কৃষ্ণের সমর্থন ও উৎসাহে খাণ্ডববনেই নতুন রাজধানী পত্তনের সিদ্ধান্ত হলো।

বন কেটে বসতি গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। দ্বারকা থেকে লোকজন সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। দিনরাত কাজ চললো। দেখতে দেখতে কয়েক মাসের মধ্যেই খাণ্ডববন রূপান্তরিত হলো পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে। নানা দেশ থেকে নানা জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ-জন ইন্দ্রপ্রস্থের নাম শুনে দলে দলে এলেন পাণ্ডবদের রাজধানীতে বস-বাস করতে।

পঞ্চপাণ্ডব যখন রাজধানী নির্মাণের কাজে ব্যস্ত তখন দুর্যোধন কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। হিতৈষীদের নিয়ে নিত্য সলাপরামর্শ শুরু করেছিলেন কিভাবে পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তাদের দুর্বল করা যায়। অনেক জল্পনা-কল্পনার পরে স্থির হয় যে দ্রৌপদীকে একাজে ইন্ধন রূপে কাজে লাগাতে হবে। পাণ্ডবরা সদ্যবিবাহিত। তাই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার এই হলো উপযুক্ত সময়। দুর্যোধন একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠালেন ইন্দ্রপ্রস্থে। নির্দেশ দিলেন যুধিষ্ঠিরের

সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো একথা জানাতে যে, অর্জুন মনে করেন নিজের কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরই পাঞ্চালীর সঙ্গে পাঁচভায়ের বিবাহের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ঐ চক্রান্ত না করলে পাঞ্চালী অর্জুনকেই পতিরূপে গ্রহণ করতে পারতেন। এই প্রবঞ্চনার জন্য অর্জুন অচিরে যুধিষ্ঠিরের প্রাণনাশের সঙ্কল্প করেছেন।

দুর্যোধনের অনুচর কয়েকদিন চেষ্টার পর এক সন্ধ্যায় বনপ্রান্তে যুধিষ্ঠিরের দেখা পেল। যুধিষ্ঠির তাঁর সামনে এক ব্রাহ্মণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সেই ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে অতি কৌশলে যুধিষ্ঠিরের কানে ঢেলে দিলে বিষ-বাণী। স্তব্ধ যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চেষ্টা করলে তাঁর মনোভাব বুঝতে। কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে তার কাজ শেষ হয়েছে মনে করে স্থান ত্যাগ করলে।

অন্ধকার বনপ্রান্তে যুধিষ্ঠির তখনো দাঁড়িয়ে। মনে পড়লো তাঁর জননী কুন্তীদেবীর কথা। কুম্ভকার কুটিরে দ্রুপদ কন্যাকে দেখার পর যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, তোমরা সকলেই যদি এই কন্যার পাণিগ্রহণ না করো তা-হলে তোমাদের মধ্যে সন্দেহ ও বিরোধ দেখা দেবে। অর্জুন যদি মনে করে থাকেন যে, কামনার পীড়নে অস্থির যুধিষ্ঠিরই দ্রৌপদীর পঞ্চপতির ব্যবস্থা করেছিলেন তাহলে মস্ত ভুল করেছেন তিনি। অন্য ভায়েদের মতো তিনিও দ্রৌপদীকে কামনা করেছিলেন সত্য, কিন্তু অর্জুন-লব্ধাকে ভার্যা-রূপে পাওয়ার কোনো অভিসন্ধি তাঁর ছিল না। জননীর কথায় তিনি আপত্তিও করেছিলেন প্রথমে। কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধের আশাঙ্কায় জননীর স্থির সঙ্কল্পের কথা শুনে আর দ্বিমত করতে পারেন নি। অর্জুনের কথা ভাবলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে কিন্তু তাই বলে অর্জুন তাঁর প্রাণনাশের সঙ্কল্প করবেন! না, না। একথা বিশ্বাস করাও পাপ। কিন্তু যে সন্দেহের কথা বলে গেলেন ব্রাহ্মণ তা শুধু অর্জুনের কেন, অন্য যে কোনো ভায়ের মনেও তো জাগতে পারে যে কোনোদিন তাঁদের ভার্যার পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে। সেই সংশয় থেকে বিরোধ বাধতে কতক্ষণ! তাই এখুনি এমন কোনো রীতি চালু করা দরকার যাতে

কারো মনে তাঁদের ভার্যার কোনো একজনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা না ওঠে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত কিন্তু তখনও পর্যন্ত যুধিষ্ঠির ফিরলেন না দেখে সকলে উদ্বিগ্ন হলেন। ভীমসেন জ্যেষ্ঠকে খুঁজে আনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় যুধিষ্ঠির ফিরে এসে ভায়েদের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ভার্যার প্রতি তাঁদের আচরণ-বিধি সম্বন্ধে।

সকলে আসন গ্রহণ করার পর শান্ত কণ্ঠে যুধিষ্ঠির বললেন—দেখ, এত-দিন আমরা সবাই নতুন রাজধানী গড়ে তোলার কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে আমাদের প্রিয় ভার্যা সম্বন্ধে আমাদের পারস্পরিক কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তার অবকাশ পাই নি। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এখন অন্যান্য কর্তব্যের সঙ্গে একটা নতুন কর্তব্যও, আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। সেই কর্তব্য যেমন ভার্যার প্রতি তেমনই আমাদের পরস্পরের প্রতিও বটে।

হঠাৎ এইভাবে জ্যেষ্ঠের আহ্বান শুনে চার ভাই একটু বিস্মিত হয়ে-ছিলেন। এখন ভার্যার প্রসঙ্গ শুনে সকলেই উৎসুক হয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকালেন।

কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে যুধিষ্ঠির বলতে লাগলেন—মায়ের নির্দেশে পাঞ্চালী আমাদের সকলেরই ভার্যা হয়েছে বলেই আমাদের এমন একটা নিয়ম থাকা দরকার যাতে ভার্যার সঙ্গসুখ সকলেই সমান ভাবে গ্রহণ করেতে পারেন। এ সম্বন্ধে তোমাদের সকলের মতামত শুনতে ইচ্ছা করি।

চার ভাই প্রায় সমস্বরেই বললেন—এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ভিন্ন মত নেই। আপনি যে নিয়ম প্রকাশ করবেন আমরা সকলেই তা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

যুধিষ্ঠির খুশি হয়ে বললেন—তাহলে আমাদের মধ্যে আজ থেকেই এই নিয়ম চালু হোক যে, পাঞ্চালী প্রত্যেকের গৃহে একবৎসর বাস করবেন। যখন তিনি একজনের গৃহে থাকবেন সেই সময় অন্য কোনো ভাই তাঁদের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না ঐ গৃহে। যিনি এই নিয়ম ভঙ্গ করবেন তাঁকে বারো বৎসরের জন্য বনবাসী হতে হবে।

ভীম বললেন—অতি উত্তম প্রস্তাব। আমরা সকলেই এই নিয়ম মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করছি।

মৃদু হেসে বললেন যুধিষ্ঠির—এখন আমাদের স্থির করতে হবে, পাঞ্চালী প্রথমে কার গৃহে থাকবেন। আমার মতে পাঞ্চালী আমাদের সকলের ভার্যা হলেও প্রথমে অর্জুনই তাঁকে লাভ করেন লক্ষ্যভেদ করে। সুতরাং প্রথমে অর্জুনের গৃহেই তিনি অবস্থান করুন।

জ্যেষ্ঠের দ্বিতীয় প্রস্তাব যে মনোমত হয় নি তা ভীমের হাব-ভাব দেখেই বুঝতে পারলেন অর্জুন। তিনি শান্ত গলায় বললেন—মহারাজ, তা হতে পারে না। জ্যেষ্ঠের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা করা উচিত নয়। আমাদের ভার্যা প্রথম বৎসর আপনার গৃহে, দ্বিতীয় বৎসর মধ্যম পাণ্ডবের গৃহে থাকবেন এবং এই নিয়মেই সবশেষে থাকবেন সহ-দেবের গৃহে।

অন্য ভায়েদেব সমর্থন থাকায় অর্জুনের কথাই মেনে নিয়ে যুধিষ্ঠির পাঞ্চা-লীকে নিয়মটি জানানোর ভার দিলেন অর্জুনকে।

অর্জুন প্রথমে ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণার কাছে গিয়ে তাঁদের নতুন নিয়মের কথা জানালেন। বললেন—কৃষ্ণা, পরিবারের সকলের মতামত আমি না মেনে পারি না। এজন্য তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

অর্জুনের কথায় দ্রুপদনন্দিনীর কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। নিশ্চল, নীরব সেই মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হলো যেন এক পাষাণ-প্রতিমার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে। কে দেবে সাড়া? শরীর আছে কিন্তু নেই তার মন, হৃদয়-ভোলানো হাসি, নয়নের সেই কামোদ্রেককারী দৃষ্টি, দেহবল্লরীর চিত্তাকর্ষক হিল্লোল। জীবনের সব লক্ষণ যেন হারিয়ে গেছে কোন্ খণ্ড প্রলয়ের মুখোমুখি হয়ে।

বিষণ্ণ অর্জুন নিঃশব্দে নতমুখে চলে গেলেন ধীরপায়ে।

সেদিকে তাকিয়ে পাঞ্চালীর মনে হলো অর্জুন যেন পালিয়ে বাঁচলেন।

তাঁর কথা যেন অশনি সংকেত। নারীর জীবনের প্রথম যে রাত দয়িতের সান্নিধ্যে মধুময় হয়ে ওঠে, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তা অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কামনার পীড়ন নীরবে সহ্য করার ঊষাহীন অন্ধকার রজনী হয়ে নেমে আসবে তার জীবনে! যাকে সে চেয়েছে সমস্ত সত্তা দিয়ে আপন করে নিতে তাকে সরে যেতে হবে জন্মসূত্রে অগ্রজের দাবি মেটাতে!
পাঞ্চালী অস্থির হয়ে ওঠে।
—কেন? কোন্ অজানা অপরাধে তার জীবনে এই বিড়ম্বনার সূচনা!
চকিতের জন্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্বয়ংবর সভার দৃশ্যটা। রূপে-গুণে অর্জুন সমতুল যুবক কর্ণ যখন উদ্দীপ্ত আশা নিয়ে লক্ষ্যভেদে উদ্যত হলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই তার একটি মাত্র কথায় কর্ণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেল—'সূতপুত্রকে আমি বরণ করবো না।'
সেই প্রত্যাখ্যান কতখানি নির্মম আঘাত হেনেছিল কর্ণের প্রাণে সে কথা ভাববার মতো অবকাশ তখন ছিল না। তার কাছে সেদিন শুধু কর্ণ কেন, অর্জুন ছাড়া আর সবাইকে তো সূতপুত্র বলে মনে হয়েছিল!
আজ মনে হয়, হয়তো ব্যথিত কর্ণের দীর্ঘশ্বাসের নিদারুণ উত্তাপেই শুকিয়ে গেল অর্জুনের কণ্ঠলগ্ন বরমাল্যখানি। অপমানিত, ক্ষুব্ধ কর্ণের অভিশাপে সেই মাল্যখানি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের কণ্ঠলগ্ন হলো। কর্ণের মতোই সমান অনাকাঙ্ক্ষিত চারটি পুরুষ বিনা লক্ষ্যভেদে লাভ করলেন পাঞ্চালীর স্বামিত্ব।
অন্তর মথিত করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। একটা উত্তরের আশায় মন আকুল হয়ে ওঠে।
কিন্তু কে বলে দেবে তাকে তার হৃদয় নিয়ে এই নির্মম প্রতারণার শেষ কোথায়!
বাহবা দিতে ইচ্ছা হয় পাণ্ডবদের অনুভূতির। সহজ বুদ্ধিতে তাঁরা সেদিন যদি ভেবে দেখতেন তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারতেন—কত বড় অপরাধ করতে যাচ্ছেন নিজেদের কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ নিয়ে। কেন তাঁরা এই সহজ সত্য বুঝতে পারলেন না যে, দেহ সম্ভোগের সুযোগ

ঘটলেও হৃদয়-মন কোনোদিন জোর করে আদায় করা যায় না। প্রেমহীন দেহটাই এত কাম্য হয়ে উঠলো পাণ্ডবদের!

একটা অসহনীয় গ্লানি আর ক্ষোভে হৃদয় পুড়তে থাকে। মনের মানুষ যেন হারিয়ে গেছে জন-অরণ্যে। নিজেকে বড় নিঃস্ব, বড় একা মনে হয় পাঞ্চালীর।

১১

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সহবাসের প্রথম সন্ধ্যা ঘনায়মান।

আজ থেকে একটি বৎসর পাঞ্চালীর অবস্থান জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের গৃহে।

পরিচারিকাবৃন্দ নব বস্ত্র, অলংকার, অঙ্গসজ্জা ও মাল্যাদি প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে এসেছে থরে থরে। অনিন্দ্য সুন্দর সাজে সাজিয়ে তুলবে পাঞ্চালীর যৌবনদীপ্ত বরতনু।

বাধা দিলে না পাঞ্চালী। অনেকক্ষণ ধরে নিপুণহাতে তাকে সাজিয়ে দিলে পরিচারিকারা। সিঁথিতে সিন্দূর, কপালে চন্দনফোঁটার মাঝখানে সিন্দুর বিন্দু দিয়ে চরণ দুটি রাঙিয়ে দিলে অলক্ত রাগে।

সুবাসিত জলে গাত্র মার্জনা করে মূল্যবান শাড়ি পরিয়ে কণ্ঠে দুলিয়ে দিলে নানা অলঙ্কার আর ফুলের মালা।

নববধূর সাজে দ্রৌপদীকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে জানালার কাছ থেকে সরে এলেন যুধিষ্ঠির। আনতা পাঞ্চালীর উদ্দেশে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল-লেন কল্যাণী, আয়ুষ্মতী হও। তোমাকে ভার্যারূপে লাভ করে আমরা পাঁচভাই নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি।

মাথা তুলে সামনের দিকে তাকাতে খোলা বাতায়নের দিকে চোখ

পড়লো। কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত। মনে হলো বিশ্বভুবন যেন অন্ধকারে ডুবে আছে।

যুধিষ্ঠির পালঙ্কে বসে পাঞ্চালীকে বসতে বললেন। এগিয়ে গিয়ে পালঙ্কের বাজু ধরে দাঁড়ালো পাঞ্চালী। যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। পাঞ্চালীও চোখ তুলে তাকালে। মনে হলো যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ। তাঁর কণ্ঠেও বাজলো একটা বিষণ্ণতা। বললেন —কল্যাণী, জানি না তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেছি কিনা। তোমাকে সামান্য নারীরূপে গণ্য করি না আমি। তুমি অনন্যা। তোমার প্রতি পাণ্ডবদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আর আছে আস্থা ও প্রত্যাশা। যদি আমাদের ব্যবস্থায় কোনোও অন্যায় দেখে থাকো তবু আমি:আশা করি পাণ্ডবদের সকলের কল্যাণের কথা ভেবেই সে অন্যায়কে লঘু বলে মনে করবে। সকলের প্রতি সমান প্রীতি পোষণ করবে মনে।

নির্বাক পাঞ্চালী মাথা নামিয়ে যুধিষ্ঠিরের কথায় সমর্থন প্রকাশ করলে। যুধিষ্ঠির পদচারণা করতে লাগলেন কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। তাঁর সঞ্চারী দৃষ্টি মাঝে মাঝে যেন স্পর্শ করে পাঞ্চালীকে। কানে আসে চলমান যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বর। —চারুহাসিনী, তুমি হয়তো জানো, আমরা ধর্মপথে থেকেই আমাদের ন্যায্য রাজ্য অধিকার করতে চাই। কিন্তু দুর্যোধন ও তার হিতৈষীদের পরামর্শে রাজ্য ও রাজ্যের জনগণের কাছ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের খাণ্ডব বনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা ভাবতেও পারেন নি যে, শ্বাপদসঙ্কুল সেই মহারণ্যে আমরা অক্ষত অবস্থায় বেঁচে থাকবো। কিন্তু আমাদের পরিশ্রমের ফলে সে অরণ্য আজ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রূপান্তরিত। জনগণের কাছেও আজ হস্তিনাপুরের চেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের আকর্ষণ অনেক বেশি। কিন্তু আমার আশঙ্কা যে, এই সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যটুকুও দুর্যোধনেরা সহ্য করতে পারবে না। আমাদের প্রতিষ্ঠাই তাদের ঈর্ষাকে আরও ক্ষুরধার করে তুলবে। তারা জানে যে, পঞ্চপাণ্ডবের সম্মিলিত শক্তি অজেয়। তাই তারা চেষ্টা করছে আমাদের মধ্যে বিভেদ জাগাতে। আর কল্যাণী, সে

কাজে তোমাকেই তারা ইন্ধনরূপে ব্যবহার করতে চায়! তাই পাঞ্চালী, আমি তোমার কাছে···

কথা শেষ হওয়ার আগেই যুধিষ্ঠির সামনে এসে দাঁড়ান। নতমুখী ভার্যার চিবুক ধরে গাঢ় স্বরে বলেন—ভদ্রে! মাথা তোলো। তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি আমাকে নববলে বলীয়ান করে তুলবে। এস পাঞ্চালী, আমরা ধর্মকে আশ্রয় করে অভীষ্ট লাভ করি।

পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে বললে—মহারাজ, পাণ্ডবদের মনোবাসনা পূর্ণ হোক। আমি এমন কোনো কাজ করবো না যাতে দুর্যোধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তবে···

যুধিষ্ঠির উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তবে কি পাঞ্চালী?

—আমি আশা করবো যে আমার পঞ্চপতি যেন এবিষয়ে অবহিত থাকেন। নাহলে পাপ যে-কোনোও রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে।

যুধিষ্ঠির মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিলেন পাঞ্চালীকে। খুশির স্বরে বললেন—মনস্বিনী, তুমি যথার্থ বলেছ। আমাদের সবাইকে এবিষয়ে সদা সচেতেন থাকতে হবে।

কথায় কথায় রাত্রি গভীর হয়। দীপশিখা স্তিমিত হয়ে আসে। যুধিষ্ঠিরের চোখে নতুন ভাব লক্ষ্য করে পাঞ্চালী। গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠা সে দৃষ্টি চিনতে কোনো নারীর বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটে না।

যুধিষ্ঠিরের কামনাদীপ্ত দৃষ্টি স্পর্শ করলো পাঞ্চালীর সর্বাঙ্গ। একটা উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ নেমে এলো অধরে। সে স্পর্শ ছড়িয়ে গেল কপালে। গণ্ডদেশ উত্তপ্ত করে রক্তিম শীতল ওষ্ঠপ্রান্তে এসে মিশে গেল। নিস্পন্দ পাঞ্চালী চোখ বুজেই অনুভব করলে একটা কঠিন আসঙ্গলিপ্সা সবল বাহুর কঠিনতর নিষ্পেষণ।

দীপশিখাহীন অন্ধকারের স্তূপে হারিয়ে গেল পাঞ্চালীর পাষাণ-প্রতিমা।

১২

একটি করে রাত যায় আর যুধিষ্ঠিরের কামনার পীড়ন সহ্য করতে করতে পাঞ্চালী ভুলে যায় তার নিজের সত্তার কথা. স্বাতন্ত্র্যের কথা। ভুলে যায় সে অর্জুন-লব্ধা, অর্জুন-প্রিয়া।

বৎসর প্রায় পূর্ণ হতে চলেছে। এমন একদিন ঘটলো সেই ঘটনা যার ফলে তার মন বুঝি আবার জেগে উঠলো আত্মবিলুপ্তির সুষুপ্তি কাটিয়ে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধন লুণ্ঠনে ব্যতিব্যস্ত একদল ব্রাহ্মণ ছুটে এসেছিলেন রাজদ্বারে প্রতিকারের আশায়। যুধিষ্ঠিরের দর্শন না পেয়ে উত্তেজিত ব্রাহ্মণগণ রাজার ঔদাসিন্যের নিন্দায় যখন মুখর তখন আর স্থির থাকতে না পেরে অর্জুন গিয়ে তাঁদের অভিযোগ শুনে দস্যুদের কবল থেকে গোধন ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ব্রাহ্মণগণ খুশি হলেন।

তূর্বাণ তৃতীয় পাণ্ডবের সঙ্গের সাথী। কিন্তু দস্যুদমনে যাবার আগে ভাবলেন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নেওয়া উচিত। বিলম্ব হলে দস্যুরা পালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে মনে করে অর্জুন সেই গোধূলিলগ্নে তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রবেশ করলেন যুধিষ্ঠিরের কক্ষে।

যুধিষ্ঠির তখন পালঙ্কে পাঞ্চালীর সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন। ক্ষণেকের জন্য অপাঙ্গে পাঞ্চালীকে দেখে মাথা নামিয়ে নিলেন অর্জুন। অগ্রজের দিকে তাকিয়ে তাঁর আকস্মিক আগমনের কারণ জানালেন।

যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দস্যুদমনের কাজে অর্জুনের জয় কামনা করে আশীর্বাদ করলেন।

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

অর্জুনের বক্রদৃষ্টি পাঞ্চালীর নজর এড়ায়নি। তার মনে হলো, অর্জুন যেন

বলে গেলেন—প্রিয়তমে, দীর্ঘদিনের অদর্শনে অধীর হয়েই তোমাকে শুধু একবার দেখে গেলাম।

দস্যুদলকে ছিন্নভিন্ন করে গো-ধন ফিরিয়ে আনলেন অর্জুন। ব্রাহ্মণগণ অপহৃত সম্পদ ফিরে পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের জয়গান করতে করতে বিদায় নিলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে সেই সংবাদ জানিয়ে পারিবারিক নিয়মভঙ্গের জন্য বারো বৎসর ব্রহ্মচারীর মতো বনবাসের অনুমতি চাইলেন। লজ্জিত, বিষণ্ণ যুধিষ্ঠির অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝালেন যে, বিপদকালে এবং অনিচ্ছায় নিয়মভঙ্গ দোষণীয় নয়। কিন্তু অর্জুন কিছুতেই মেনে নিলেন না সেই যুক্তি। পরদিন প্রাতেই ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। যুধিষ্ঠিরের মুখে পাঞ্চালীও শুনেছিল অর্জুনের স্বেচ্ছায় বনগমনের সংকল্পের কথা। সারা রাত অনিদ্রা থেকে প্রভাতে এসে বসলো উদ্যানের একান্তে। সহসা অর্জুন এসে বসলেন পাশে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ব্যথার যেন বিনিময় হলো চারটি চোখের নীরব ভাষায়।

অর্জুন ছোট্ট করে ডাকলেন—কৃষ্ণা।

পাঞ্চালীর প্রাণ-তন্ত্রীতে অনুরণন উঠলো সে ডাকের। একটা অব্যক্ত সুখ আর অনির্দেশ্য ব্যথার শিহরণে কেঁপে উঠলো শিথিল তনুখানি। চোখ বুজে গেল।

অর্জুনও কান পেতে শুনলেন কৃষ্ণার ছোট্ট ডাকটি—পার্থ। হৃদয় ভরে গেল গভীর আনন্দ আর বেদনায়। অভিমানের বশে দাম্পত্য নিয়মভঙ্গ করে কি ভুলই না করেছেন! সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেও কৃষ্ণা আজও অর্জুন-প্রিয়া। নিজের মূঢ়তার জন্য দুঃখ হলো। কৃষ্ণাকে দোষ দিয়ে লাভ কি! সেও তো তাঁদেরই মতো নিয়মের বাঁধনে বাঁধা। পরক্ষণেই মনে হয়, না, এই ভালো। কাছে থেকেও না পাওয়ার গোপন বেদনায় তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে হারিয়ে যাওয়াই ভালো। তাই ইচ্ছা করেই নিয়মভঙ্গ করেছেন তিনি। কোনো ভুল করেন নি। নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—কৃষ্ণা, তুমিও বোধহয় শুনেছ যে, নিয়মভঙ্গের জন্য আমাকে বারো বৎসরের জন্য বনে যেতে হচ্ছে?

উদ্‌গত অশ্রু গোপন করে পাঞ্চালী বললে—পার্থ, সত্য করে বলো তো, নিয়মভঙ্গের অজুহাতে তুমি কি স্বেচ্ছায় বনগামী হতে চাওনি ?

দ্রুপদ-নন্দিনীকে শুধু সুন্দরী নয়, মনস্বিনী বলেও মনে করতেন অর্জুন। কিন্তু তাঁর নিভৃত হৃদয়ের গোপন কামনা-সঞ্জাত ঈর্ষাও যে কৃষ্ণার অজানা নেই তা বুঝতে পারেন নি। বিস্ময় দূর হলো পাঞ্চালীর কথায়।

—পার্থ, যদি কৃষ্ণা হতে তবেই শুধু বুঝতে পারতে তোমাকে পেয়েও কেন অর্জুনকে দূরে যেতে হয় স্বেচ্ছায় নিয়মভঙ্গ করে। তুমি যখন স্থির করেছ তখন তো যাবেই। তবে যাবার আগে একটা কথা শুধু বলে যাও, যেখানে তুমি নিজেই আর থাকতে পারছ না-সেখানে আমাকে রেখে যাচ্ছ কোন্ মহৎ কর্তব্য পালন করতে ?

অর্জুনের ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে আবেগে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—আমাকে ক্ষমা করো কৃষ্ণা। আর পারো তো এই দুর্ভাগার কথা মনে রেখো।

১৩

তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয়। যত্র সা সাত্বতাত্বজা
সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে ॥

ব্রহ্মচারী অর্জুনের নানা তীর্থবাসের সংবাদ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে পৌঁছায় দূত-মুখে। পাঞ্চালীরও কানে আসে হিমালয়-তীর্থে অবস্থানকালে প্রথমে কৌরব নাগের কন্যা উলুপীর সান্নিধ্য, তারপর মণিপুর-অধিপতি চিত্র-বাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে দীর্ঘ সহবাসের কথা। বনবাসের শেষ দিকে শোনা যায় অর্জুনের প্রভাস-তীর্থে অবস্থানের সংবাদ।

পাঞ্চালীর জানতে ইচ্ছে হয় অর্জুন কি ইন্দ্রপ্রস্থের কোনো সংবাদ পান। জানেন কি চার ভ্রাতার ঔরসে জাত তার চারটি শিশুসন্তানের কথা।

এই চারটি শিশুকে নিয়ে পাঞ্চালী এক নতুন জগৎ গড়ে তোলে নিজের মনে। প্রবঞ্চিত হৃদয় চরিতার্থ হয় বাৎসল্যে। ব্রহ্মচারী অর্জুনের নিত্য নতুন নারীসঙ্গের সংবাদ শুনেও ঈর্ষার পরিবর্তে সহানুভূতিই জাগে মনে। ভাবে, কাছে থাকলে অবরুদ্ধ কামনার দংশনে হয়তো পাণ্ডবদের সংহতি যেত নষ্ট হয়ে। তার চেয়ে বরং দূরে থাকাই ভালো।

কিছুদিন পরে আবার সংবাদ পাওয়া যায় অর্জুনের। প্রভাস থেকে রৈবতকে গিয়ে কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হরণ করেছেন তাকে। অর্জুনের এই অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ বৃষ্ণিবীরগণ বলরামের নেতৃত্বে অর্জুনকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিলেন। পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে দেখে শেষে কৃষ্ণ নানা যুক্তিতর্কে বৃষ্ণিদের শান্ত করে অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। সুভদ্রার সান্নিধ্যে মহা সুখে আছেন অর্জুন।

সুভদ্রা হরণের সংবাদে পাঞ্চালী আর স্থির থাকতে পারে না। অর্জুনের প্রতি বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায়। পাঞ্চালীর ভালবাসার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছেন অর্জুন! কৃষ্ণের প্রতি অভিমানেও হৃদয় ভরে যায়। তিনিও একবার ভাবলেন না অভাগিনী কৃষ্ণার কথা!

দেখতে দেখতে অর্জুনের বনবাসের কাল উত্তীর্ণ হয়। শেষাংশ পুষ্করতীর্থে অতিবাহিত করে অর্জুন ফিরে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। কিন্তু একা ও ব্রহ্মচারীর বশে নয়। সঙ্গে রক্তাম্বরা সুভদ্রাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন শস্ত্রপাণি অর্জুন।

প্রাসাদে প্রবেশ করে জননী কুন্তীদেবী ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনা করলেন। ব্রাহ্মণদের দিলেন পাদ্য-অর্ঘ্য। তারপর অন্য সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে অতিবড় অপরাধীর মতো গিয়ে দাঁড়ালেন শিশুপুত্র পরিবৃত ভার্যার কাছে।

পাঞ্চালীর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে গিয়ে বাধা পেলেন। কানে এলো অভিমানিনী ভার্যার তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর।

—যেখানে সুভদ্রা আছে সেইখানেই যান। আমার কাছে আসার কোনো প্রয়োজন দেখি না।

অর্জুন কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই পাঞ্চালীর ক্রুদ্ধ স্বর আবার শোনা গেল। —হে পার্থ, দ্বিতীয় বন্ধনে প্রথম বন্ধন স্বতই শিথিল হয়ে পড়ে।

স্ফুরিত-অধরা পাঞ্চালীর মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মুখ দিয়ে একটি মাত্র কথা নির্গত হলো : ক্ষমা করো কৃষ্ণা, ক্ষমা করো তোমার অপরাধী স্বামী অর্জুনকে।

এই বলে স্থান ত্যাগ করলেন অর্জুন।

তাঁর পরামর্শে রক্তাম্বর ত্যাগ করে গোপ-বধূর বেশ পরিধান করে সুভদ্রা এসে প্রণাম করলে কুন্তীদেবীকে। তার মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদ জানালেন কুন্তীদেবী।

তারপর ধীর পদে পাঞ্চালীর কাছে গিয়ে সুভদ্রা বললেন —দেবী, আমি আপনার দাসী সুভদ্রা।

পাঞ্চালী তাকে সাদরে আলিঙ্গন করে বললে—ভগিনী, তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হোক।

১৪

সুভদ্রার বিবাহ উপলক্ষে নানা যৌতুকসামগ্রী নিয়ে সসৈন্যে বলরাম ও কৃষ্ণ এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। তাঁদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন পঞ্চপাণ্ডব। রাজধানী আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠলো। বেশ কিছুদিন যাবত যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণের পর বলরাম সৈন্য-সামন্ত, আত্মীয়স্বজন নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে আনন্দ উৎসব আর মৃগয়ায় দিন কাটাতে লাগলেন।

এতদিন ধরে কৃষ্ণকে নিছক আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতে দেখে একটু অবাক হলো পাঞ্চালী। কিছুদিনের মধ্যেই সুভদ্রা সন্তান প্রসব করলেন। কৃষ্ণ নিজেই নবজাতকের শুভ সংস্কার ও নামকরণ করলেন। তারপর

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বিদায় নেবার আগে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন পাঞ্চালীর কাছে। হাসিমুখে বললেন—কৃষ্ণা, অর্জুনকে আমি প্রিয় সখা বলে মনে করি। কিন্তু আমার যে একটি প্রিয় সখিও আছে সেকথা এতদিন বলার সুযোগ হয় নি বলেই বলা হয় নি।

পাঞ্চালীর মুখেও হাসির ঝিলিক। সকৌতুকে বললেন—আজই বুঝি বলার সুযোগ হলো?

—হ্যাঁ সখি। আজই। এখন তোমার অনুমতি পেলেই দ্বারকায় ফিরে যেতে পারি।

কৃষ্ণার চোখের তারায় দুষ্টামি ফোটে।

—তাই বুঝি! আজই যেতে হবে আর আমার অনুমতিও চাই। আচ্ছা, অনুমতি না হয় দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা জানতে ইচ্ছা করে। পুরুষে-পুরুষে ভালবাসা যে কত গভীর, কত মধুর হতে পারে তা আর কেউ না জানলেও আমি জেনেছি কৃষ্ণ আর অর্জুনকে দেখে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ সখ্য সত্যই কি সম্ভব?

কৃষ্ণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন পাঞ্চালীর মুখের দিকে। বাৎসল্য-রসে ঢলঢল মুখখানি কি সুন্দর! প্রশ্ন শুনে বললেন—

—কৃষ্ণা, তোমার সংশয় অমূলক নয়। সকলের ক্ষেত্রে হয়তো তা সম্ভব হয় না। কারণ অধিকাংশ নারীহৃদয় মধুর রসেই সম্পৃক্ত। আমি অকপটে বলছি, তুমি তাদের ব্যতিক্রম। তুমি অনন্যা। তোমার রূপরাশি পুরুষ-মাত্রেই মনোহরণ করে। পুরুষ বলেই আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু রূপের চেয়েও আমার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় তোমার ঐ অনিন্দ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে থাকা পৌরুষ দীপ্তি। লাবণ্য মণ্ডিত ঐ আননে দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির বিচ্ছুরণ। যা নেই সত্যভামার রুক্মিণীর কিংবা আর কারো। আমার গুণবতী ভার্যাদের আমি ভালবাসি। কিন্তু তোমাকে শুধু ভালবাসা নয়, অন্তরের শ্রদ্ধাও জানাই। জানাই তাই জায়া রূপে কামনা করে তোমায় অসম্মান করার কথা আমি কোনো দিনই ভাবি না। যা আমি এতদিন শুধু কামনাই করেছি কিন্তু

পাই নি কারও কাছে, তোমার কাছেই তা পাব বলে বিশ্বাস করি। আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা সফল করে তোলার জন্য তোমার সখিত্ব আমার একান্ত কাম্য। বলো কৃষ্ণা, আজ, থেকে তুমি কৃষ্ণকে তোমার সখা বলে মনে করবে ? তোমার সহায়তা পেলে আমাব স্বপ্ন সার্থক হবে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে পাঞ্চালী শুনছিল কৃষ্ণর কথা। স্বয়ংবর সভায় অর্জুনের কণ্ঠে বরমাল্য তুলে দিয়ে নিজের নারীত্ব সার্থক হলো বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই নারীত্বের ঘটলো চরম অপমান। যাকে সে প্রাণভরে ভালবেসেছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে কামনা করেছে, যখন সেই অর্জুনের কাছ থেকেই এলো চরম প্রবঞ্চনা, নারীত্বের অবজ্ঞা, তখন থেকেই সে নিঃসঙ্গ। অর্জুনের আগেই চার ভাই ভার্যার দেহ-সম্ভোগে যে সুখই পেয়ে থাকুন, সে জানে তার ভালবাসার আত্মনিবেদন তাঁরা পান নি। পান নি তার দেহলীন হৃদয়কে, প্রথম স্বামী-সঙ্গ-বিহ্বলা কুমারীর আত্মাকে। তীর্থ থেকে প্রত্যাগত অর্জুনও আর চারজন স্বামীর মতোই সম্ভোগ-তৃপ্ত হয়েছেন। কিন্তু অর্জুনও পান নি কুমারী কৃষ্ণার সাধ্বী হৃদয়কে। চার সন্তানের জননী আবার পূর্ণগর্ভা অর্জুনের সন্তান এখনও তার গর্ভে। যে মাতৃত্ব অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল ব্যর্থ জীবনে তাই হয়েছে পরম অবলম্বন। তাই অর্জুন-সন্তানকেও সযত্নে ধারণ করেছে গর্ভে। পাণ্ডব-প্রিয়া নয়, পঞ্চপুত্রের জননী হয়েই থাকতে চায় সে। কিন্তু একি কথা আজ কৃষ্ণের মুখে। কৈশোরের স্বপ্নভরা দিনে এই কৃষ্ণই ছিলেন তার চিন্ময় দয়িত ! তারপর যৌবন-স্রোতে একদিন ভেসে গেল হৃদয়ের সেই মুগ্ধারতি। প্রত্যাশায় উন্মুখ হৃদয় বেছে নিল যৌবনের প্রতিমূর্তি-রূপে অর্জুনকে। কিন্তু তারপর ভাগ্যচক্রে তার জীবম যেন ডুবে গেল একটা দীর্ঘতম দুঃস্বপ্নের তমিস্রায়। অনাকাঙ্ক্ষিত, উদ্ধত পৌরুষের পীড়নে মৃত্যু হলো প্রাণ, মন, আত্মার। দুঃসহ গ্লানির হাত থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দিলে প্রথম সন্তান। তারপর আরও তিনটি। বাৎসল্যে ডুবে থাকা মনের দুয়ারে আজ যেন এক নতুন করাঘাত।

প্রীতিমাখা অনুচ্চ ডাকে সম্বিত ফিরে আসে।

—কৃষ্ণা, বলো, তোমার মন কি চায় ?

আয়ত চোখদুটি কৃষ্ণের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে পাঞ্চালী মৃদুস্বরে যেন মন্ত্রোচ্চারণ করলে।

—সখা, কৈশোর স্বপ্ন যেদিন ভেঙেছিল সেদিন তোমাকে হারিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, কোনোও দিন হারাই নি তোমাকে। প্রাণের সখা তুমি। তোমাকে যেন কোনো দিনই না হারাই।

কৃষ্ণের মুখে কৃতকৃতার্থের হাসি।

—প্রিয় সখি, আমার জীবনও আজ ধন্য বলে মনে করছি। এখন যাবার সময় হয়েছে। তার আগে সুভদ্রাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যেতে চাই। বলো সখি, তাকে গ্রহণ করবে তুমি ?

অশ্রুসজল চোখে পাঞ্চালী বলে—সখা, তোমার নির্দেশ সাধ্যমতো পালন করবো। আবার কবে তোমার দেখা পাব বলবে না ?

কৃষ্ণের মুখে একটা রহস্যের হাসি ফোটে।

বলেন—কে জানে ! হয়তো অচিরেই আবার দেখা হবে।

১৫

অসূর্যম্পিব সুষেণ নিবাতমিম বায়ুনা।
ভাসিতং হ্রাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥

রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় করে ফিরলেন। তার আগেই কৃষ্ণের সহায়তায় ভীম মগধ-রাজ জরাসন্ধকে বধ করে বৃষ্ণি-অন্ধক বিরোধীদের প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের কৃষ্ণ-বিরোধিতা যে বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নি তা জানা গেল যজ্ঞকালে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দেওয়ার সময়। ভীষ্মের উপদেশে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে মনস্থ করে সহদেবকে নির্দেশ দিলেন কৃষ্ণের কাছে অর্ঘ্য নিয়ে যেতে।

সঙ্গে সঙ্গে চেদীরাজ শিশুপাল উঠে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে অর্ঘ্য প্রদানের তীব্র বিরোধিতা করলেন। সমবেত রাজ-সমুদ্রও বিরোধিতায় উত্তাল হয়ে উঠলেন। শিশুপাল উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণের নিন্দা শুরু করলেন এবং কৃষ্ণকে আস্ফালন করলেন যুদ্ধে। কৃষ্ণের হাতে শিশুপাল নিহত হতে রাজবৃন্দ অবশ্য বাহ্যতঃ শান্ত হলেন কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি ও কৃষ্ণের সমর্থক পাণ্ডবদের প্রতি আরও বিরূপ হয়ে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

যুধিষ্ঠিরকে বিঘ্নমুক্ত করে যশঃগৌরবের মুকুটধারী কৃষ্ণ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাণ্ডব অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। পাঞ্চালীর সঙ্গে আবার দেখা হলো। বাসুদেবকে স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়াতে দেখে পাঞ্চালীর মুখেও ফুটলো মিষ্টি-মধুর হাসি। লঘু কণ্ঠে কৃষ্ণ বললেন—সসাগরা ভারতের অধিশ্বরীর কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

মধুর কটাক্ষ হেনে পাঞ্চালী উত্তর দিলে—আগমনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটলে অনুমতি নামঞ্জুর হওয়ারই প্রবল সম্ভাবনা ছিল।

কৃষ্ণ আবার হাসলেন। নবাগত অর্জুন-পুত্রকে দেখতে চাইলেন। পাঞ্চালীর নির্দেশে পরিচারিকা নিয়ে এলো শ্রুতবর্মাকে। মহামূল্যবান মণিরত্ন খচিত স্বর্ণাভরণ দিয়ে অর্জুন-পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন কৃষ্ণ। তারপর তাঁর মেঘরঙা গরুড়ধ্বজ রথ ছুটে চললো দ্বারকা অভিমুখে।

রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে সমাগত রাজবৃন্দ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আপ্যায়নে প্রীত হয়ে ফিরে গেলেন নিজ নিজ রাজ্যে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরাও ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে কিন্তু প্রীত হয়ে নয়, ঈর্ষার আগুন বুকে নিয়ে। পাণ্ডবদের অগাধ ঐশ্বর্য, রাজারাজড়াদের যুধিষ্ঠিরের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত মহামূল্যবান উপহার সামগ্রী দেখে তাঁরা মনে করলেন পাণ্ডবেরা না থাকলে এসবই তাঁদের করায়ত্ত হতো। ঈর্ষার গোপন বহ্নিতে ইন্ধনের কাজ করলো ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের নির্বুদ্ধিতার বিড়ম্বনা আর ভীম ও অর্জুনের উপহাস বর্ষণ।

দুর্যোধনকে ক্রোধে ফুঁসে উঠতে দেখে মাতুল শকুনি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন

যে, অর্থ ও সৈন্যবলে কৌরবদের চেয়ে শতগুণে বলীয়ান পাণ্ডবদের যুদ্ধের হুমকি দেখানো নিরর্থক। সুতরাং ক্রোধ গোপন রেখে উপযুক্ত সুযোগ সন্ধানই যুক্তিযুক্ত। মাতুলের কথা শুনে হতাশাগ্রস্ত দুর্যোধন যে কোনো উপায়ে পাণ্ডবদের জব্দ করার উপায় চিন্তা করতে বললেন শকুনিকে। ম্রিয়মাণ দুর্যোধনের কথায় খুশি হয়ে বিনা রক্তপাতে পাণ্ডবদের পরাস্ত করার দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হলেন শকুনি। তাঁর পরামর্শে ও দুর্যোধনের পীড়াপীড়িতে পুত্র-স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী বিদুরকে বললেন, ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জন্য হস্তিনাপুরে আসার আহ্বান জানাতে। রাজার নির্দেশে বিদুর রাজধানী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন মহা খুশি হয়ে দ্যূতসভাগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করে ফেললেন।

যুধিষ্ঠির নিজেকে পাশা খেলায় পারদর্শী বলেই মনে করতেন। কাজেই বিদুরের কথায় হস্তিনাপুর যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভীম আপত্তি জানালেন পাশা খেলায়। যুধিষ্ঠির অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। পাঞ্চালী অর্জুন, নকুল, সহদেব, ভীম নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন। হস্তিনাপুরে গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পাদ বন্দনা করে সেদিনের মতো বিশ্রাম নিতে গেলেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ভবনে। পাঞ্চালীর স্থান হলো কৌরব অন্তঃপুরের একটি ক্ষুদ্রতম কক্ষে। উত্তম বেশভূষা, অলঙ্কারাদি দেখে কুরু-বধূগণ যে তার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হয়ে উঠেছে সে কথা বুঝতে পারলেও পাঞ্চালী তাদের সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে কুশল-বিনিময় করে গান্ধারীকে প্রণাম করে নিজের কক্ষে গেল বিশ্রাম নিতে।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চপাণ্ডব দ্যূতসভায় উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের ধারণা ছিল দুর্যোধনই তাঁকে আহ্বান করবেন পাশা খেলায়। কিন্তু দুর্যোধনের বদলে আহ্বান জানালেন মাতুল শকুনি। যুধিষ্ঠির জানতেন শকুনি পাশা খেলায় যত না নিপুণ তার চেয়ে অনেক বেশি শঠ তাই শকুনির সঙ্গে খেলতে নিরুৎসাহ বোধ করলেন। কিন্তু আহৃত হয়ে নিবৃত্ত

হওয়া তাঁর স্বধর্মবিরোধী। তাই অনিচ্ছা দমন করে খেলতে বসলেন। পাশাকে উপলক্ষ করে যেন নিজের এবং পাণ্ডবদের ভাগ্য নিয়েই ছিনি-মিনি খেলায় মত্ত হলেন যুধিষ্ঠির। মহামূল্য মণিমুক্তা থেকে শুরু করে যুধিষ্ঠির একে একে পণ রাখলেন দাসদাসী, রথ-রথী, ভূসম্পদ, গোসম্পদ। কিন্তু শকুনির পাশা নিক্ষেপের কৌশলে সর্বস্বই খোয়া গেল। হতবুদ্ধি যুধিষ্ঠির শকুনির প্ররোচনায় পণ রাখলেন চার ভাইকে। তারপর নিজেকে। তবু জয়ের মুখ দেখতে না পেয়ে উত্তেজিত, বুদ্ধিভ্রংশ যুধিষ্ঠিরকে শকুনিই আবার স্মরণ করিয়ে দিলে পাঞ্চালীর কথা। বললে—যুধিষ্ঠিরকে, এখনই ক্ষান্ত হচ্ছ কেন? পাঞ্চালীকে পণ রেখে আবার খেলা শুরু করো না?

যুধিষ্ঠিরও ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে পাঞ্চালীকে পণ রাখলেন। পাশা ফেলেই উল্লাসে ফেটে পড়লো শকুনি—জিতেছি, জিতেছি। সে উল্লাস শুনে ধৃত-রাষ্ট্রও উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি পণ জিতলে শকুনি? কি পণ?

দুর্যোধন সোল্লাসে বলে উঠলেন—সব পণ আমরা জিতেছি, পাঞ্চালীকেও। জয়ের গর্বে আত্মহারা দুর্যোধন বিদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন—পাণ্ডব-প্রিয়া পাঞ্চালীকে সভাস্থলে নিয়ে আসুন, কত্তা। অন্যান্য দাসীর মতো পাঞ্চালীও আমাদের গৃহমার্জনা করুক।

বিদুর বাধা দিয়ে বললেন—মূর্খ, তোমার মতো লোকেই শুধু একথা বলতে পারে। পাণ্ডব-জায়া দ্রৌপদী কুরু-পাণ্ডবদের কুলবধূ। তিনি কোনো ক্রমেই দাসী হতে পারেন না। তাছাড়া যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে পণ রেখে পরাস্ত হওয়ার পরে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। তুমি এখনো সংযত হও। ভুলে যেও না বাঁশগাছে ফুল ধরলে সমগ্র বাঁশঝাড়ই বিনষ্ট হয়। সুতরাং সাবধান।

দুর্যোধন বিদুরের কথায় কর্ণপাত করলে না। প্রতিকামীকে এই বলে আদেশ দিলে: তুমি অবিলম্বে দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এসো। কোনোও ভয় নেই তোমার।

১৬

পাঞ্চালী নিজের কক্ষে বসে পাশা খেলার ফলাফলের কথাই ভাবছিল। ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের সম্মতি প্রকাশ তার আদৌ ভালো লাগে নি। যুধিষ্ঠিরকে নিবারণও করতে পারে নি কারণ সম্মতি দেওয়ার সময় তিনি কারও মতামতের অপেক্ষা করেন নি। তাছাড়া শুনেছিল যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় নিপুণ। তাই মনে পরাজয়ের কোনো আশঙ্কা ছিল না কারও মনে।

কিন্তু হস্তিনাপুরে পৌঁছে যখন জানা গেল যে দুর্যোধনের পরিবর্তে শকুনি খেলতে বসেছেন যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে তখন থেকেই একটা উদ্বেগ দেখা দেয় মনে।

তবু প্রতীকামীকে আসতে দেখে প্রথমে ভাবলে যে সে নিশ্চয় যুধিষ্ঠিরের জয়ের সংবাদই নিয়ে আসছে। কিন্তু নিতান্ত অপরাধীর মতো কক্ষে প্রবেশ করে প্রতিকামী যা বললে তাতে বোঝা গেল যে সর্বনাশের আর কিছুই বাকি নেই।

যুধিষ্ঠির শুধু পরাস্তই নন, সর্বস্ব হারিয়েও ক্ষান্ত হন নি। শেষ পর্যন্ত নিজেদেরও দাস ও পাঞ্চালীকে কৌরবদের দাসীতে পরিণত করেছেন। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থির, ধীর, ধর্মপরায়ণ হয়েও যুধিষ্ঠির যে নিছক জেদের বশে এমন অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাতে পারেন নিজের কানে শুনেও সে কথা যেন বিশ্বাস হয় না।

মনে হয়, যুধিষ্ঠিরই না হয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকবেন কিন্তু সভাস্থলে ভীম-অর্জুনও তো উপস্থিত রয়েছেন! তাঁরাও কি সমান বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছেন। নিজেদের এত বড় সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে দেখেও তাঁরা কি নিবৃত্ত করতে পারলেন না যুধিষ্ঠিরকে।

পরক্ষণেই মনে হয়, যা ঘটার তা যখন ঘটেই গেছে তখন আর পঞ্চভর্তার

করণীয়ের কথা ভেবে লাভ কি। পঞ্চস্বামী যখন নিষ্ক্রিয় তখন আত্ম-সম্মান রক্ষার চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে।

প্রতিকামীকে অপেক্ষা করতে দেখে পাঞ্চালী বলে—সূতপুত্র, তুমি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করে এসো তিনি কাকে আগে পণ রেখেছিলেন নিজেকে না আমাকে!

কিছুক্ষণ পরেই প্রতিকামী ফিরে এলো। জানালে প্রশ্নের কোনো উত্তর দেন নি যুধিষ্ঠির। তিনি নতমুখে দাঁড়িয়েই আছেন।

তবু হতাশ না হয়ে পাঞ্চালী বললে—তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর আর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করে এসো তাঁদের কি অভিমত।

সেই জিজ্ঞাসার উত্তর জানাতে প্রতিকামী আর ফিরে এলো না। এক মুখ উল্লাস নিয়ে দুঃশাসন প্রবেশ করলে পাঞ্চালীর কক্ষে।

কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

—পাঞ্চালী, তুমি কোন্ সাহসে দুর্যোধনের আদেশ অমান্য করছ? যদি অপদস্থ হওয়ার বাসনা না থাকে এখুনি সভাস্থলে গিয়ে ভজনা করো দুর্যোধনকে! আর আমার কথা যদি না শোন তাহলে দাসীরও অধম হতে হবে তোমাকে।

দুর্বৃত্তদের কবল থেকে আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় না দেখে পাঞ্চালী ধৃতরাষ্ট্রের মহিষীদের কক্ষে আশ্রয় নিতে ছুটলো। কিন্তু দুঃশাসন দৌড়ে গিয়ে বাধা দিলে। তারপর বেণী ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল দ্যূতসভায়। স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে দলিতা ফণিনীর মতো গর্জন করে উঠলো পাঞ্চালী।

—কোথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র? কোথায় কুরু-পিতামহ ভীষ্ম? কোথায় ক্ষত্তা বিদুর আর পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য? চোখের সামনে পাণ্ডব-কুলবধূর নির্যাতন দেখেও আপনারা নির্বাক কেন? ভরতবংশীয়গণ কি এতই চরিত্র-ভ্রষ্ট, নিবীর্য যে, কুলনারীর লজ্জাটুকু পর্যন্ত দস্যুরা অবাধে লুণ্ঠন করবে তাঁদের সামনে! এই বিরাট রাজসভায় শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়াশীল সজ্জনের কি এতই অভাব যে নারীর মর্যাদাও রক্ষা পাবে না!

সকলকে নিরুত্তর, নতমুখ দেখে পঞ্চপাণ্ডবের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে পাঞ্চালী আবার শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—পঞ্চপাণ্ডবই যদি ক্লীবের মতো চোখের সামনে পত্নীর লাঞ্ছনা দেখেন তখন নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে দোষ দেওয়া নিরর্থক।

লাঞ্ছনা, উত্তেজনায় কম্পমানা, বিবশা দ্রৌপদীকে একটা ধাক্কা দিয়ে দুঃশাসন অট্টহাস্যে বলে উঠলো—দাসী, আমাদের দাসী। দ্রৌপদী কোনোও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ভীষ্মের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কুরুবৃদ্ধগণ কি এতই অশক্ত হয়ে পড়েছেন যে ধর্ম-অধর্মের ন্যায়-অন্যায়ের বোধও হারিয়ে ফেলেছেন ?

বারবার ব্যাকুল কণ্ঠের জিজ্ঞাসায় ভীষ্ম বললেন—যার যে জিনিসে অধিকার নেই, তা পণ রাখা যায় না, একথা সত্য। যুধিষ্ঠির সর্বসমক্ষে প্রথমে নিজে জিত হয়েছেন। সুতরাং সব বস্তুর উপর নিজের অধিকারও সেই সঙ্গে হারিয়েছেন। সুতরাং সেদিক দিয়ে দেখলে পাঞ্চালীকে পণ রাখার অধিকার তাঁর ছিল না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের দিক থেকে দেখলে বলতে হয় যে, পরাজিত স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি স্বত্ব থাকে। কাজেই সূক্ষ্ম ন্যায়মতে পাঞ্চালীকে পণ রাখা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সঙ্গত না অসঙ্গত তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

সর্বসমক্ষে প্রিয়তমা ভার্যার লাঞ্ছনা দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে সহ্য করেছিলেন ভীমসেন। ভীষ্মের সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। যুধিষ্ঠিরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন গর্জন করে উঠলেন—পাঞ্চালীকে পণ রাখা আপনার খুবই অন্যায় হয়েছে। কোন্ বুদ্ধিতে আপনি একাজ করলেন আমাদের মতামতের অপেক্ষা না রেখে ? পাঞ্চালীর মর্যাদা রক্ষা করা আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। তাই প্রথমেই আমি আপনার ঐ পাশালিপ্ত হাত দুটি অগ্নিদগ্ধ করবো। সহদেব, তুমি আগুন জ্বালাও।

সহদেব বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। নির্বাক যুধিষ্ঠির মাথা নামিয়ে নিলেন। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে ভীমসেনকে কোনোরকমে শান্ত করলেন।

দুর্যোধনের তর্জন-গর্জনে সভার সকলে নীরবে বসে আছেন দেখে দুর্যো-ধনেরই ছোট ভাই বিকর্ণ বললে—কুরুবৃদ্ধগণ আপনাদের উদ্দেশ্যে পাঞ্চালী যে প্রশ্ন করেছেন আপনারা তার উত্তর দিন। দুর্যোধন-দুঃশাসন বিকর্ণকে বালক বলে উপহাস করে উঠলেন। বিকর্ণ যখন দেখলে কেউই তাঁর কথায় কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না তখন মাথার ওপর হাত তুলে বিকর্ণ বলে উঠলো—সভায় এত জ্ঞানী-মানী জন থাকতে কেউ যখন পাঞ্চালীর আবেদনে কর্ণপাত করলেন না তখন আমিই বলছি, আপনারা সকলে শুনুন। ব্যসনাসক্ত লোক ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে যে কাজই করুক তা অকৃত বলেই বিবেচ্য। যুধিষ্ঠিরও পাশাসক্ত হয়ে পাঞ্চালীকে পণ রেখে-ছিলেন। তাও নিজে পরাজিত হওয়ার পরে এবং মাতুল শকুনির পরামর্শে। সুতরাং আমি মনে করি পাঞ্চালী দুর্যোধনের কথামত দাসী হতে পারেন না।

ভীষণ কোলাহলের মধ্যে কর্ণ বললেন—বিকর্ণ বালক। বালকের মতোই কথা বলেছে। শুনতে মধুর বটে তবে মূল্যহীন। সমবেত কৌরবগণ যে নিরুত্তর রয়েছেন তার কারণ তাঁরা মনে করেন পাঞ্চালী ধর্মানুসারেই বিজিত হয়েছেন।

কর্ণের কথায় উৎসাহিত হয়ে দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন পাণ্ডবদের বস্ত্র খুলে নিতে। পাণ্ডবেরা নিজেদের উত্তরীয় বস্ত্র ত্যাগ করে সভাগৃহে বসে পড়লেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বস্ত্রাঞ্চল ধরে টান দিলে তাকে বিবস্ত্রা করার উদ্দেশ্যে।

দ্রৌপদীর মনে হলো এতগুলো দুর্বৃত্তের মধ্যে যদি একা কৃষ্ণ থাকতেন তাহলে তার এই দুরবস্থা হতো না। কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ! বিপদভঞ্জন মধুসূদনের পাদপদ্ম স্মরণ করে নিজের বস্ত্র সবলে চেপে ধরলো দ্রৌপদী। হঠাৎ যেন অসীম বল অনুভব করলে নিজের দুটি বাহুতে। দুঃশাসনও অবাক হলো কুলবধূর শারীরিক শক্তির পরিচয় পেয়ে। স্ত্রীলোকের আর কত বল—এই মনে করে সর্বশক্তি দিয়ে আবার টান দিলে বস্ত্রাঞ্চল। অসামান্য উপস্থিত বুদ্ধিবলে দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ সব প্রতিরোধ শিথিল

করে দুঃশাসনের দিকে একটু এগিয়ে গেল। টাল সামলাতে না পেরে দুঃশাসন ছিটকে পড়লো সভা প্রাঙ্গণে। প্রচণ্ড আঘাতে রক্তাক্ত কলেবরে অচেতনের মতো দুঃশাসনকে পড়ে থাকতে দেখে দুর্যোধন প্রমুখ ছুটে গেলেন দুঃশাসনের পরিচর্যা করতে।

ধৃতরাষ্ট্রের হোম-গৃহে শৃগালের ডাক শোনা গেল। বাইরেও শোনা গেল গর্দভের ডাক। বিদুর বলে উঠলেন—মহারাজ, এখনোও সাবধান হোন। অধর্মের শাস্তি আর ধর্মের জয় এই ভাবেই শুরু হয়। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারীও সভাস্থলে এসে কঠোর স্বরে বললেন—মহারাজ, অমঙ্গলের লক্ষণ চারধারেই দেখা দিয়েছে। আপনার ঐ পুত্রের জন্মলগ্নে অমঙ্গলের আভাস পেয়েছিলাম, আজও তাই পাচ্ছি। ঐ কুলনাশকারী দুর্বিনীত পুত্রকে এখুনি নিবৃত্ত করুন। নাহলে সবংশে নিধন অবশ্যম্ভাবী।

গান্ধারীর কথায় ধৃতরাষ্ট্র যেন সংবিত ফিরে পেলেন। দুর্যোধনকে উদ্দেশ করে বললেন—দুর্বুদ্ধি, কৌরব-শ্রেষ্ঠদের সভায় আমার সামনে কুরুকুলের জ্যেষ্ঠা কুলবধূ পাঞ্চালীর সঙ্গে তুই কোন্ সাহসে বিতণ্ডা করছিস? দূর হয়ে যা, আমার সামনে থেকে।

তারপর স্নেহমাখা স্বরে দ্রৌপদীকে বললেন—কল্যাণী, তুমি আমার পুত্র-বধূদের মধ্যে প্রধানা। পরম বুদ্ধিমতী, ধর্মশীলা। সতী সীমন্তিনী তুমি। প্রকাশ্য সভায় তোমার নিগ্রহে আমি মর্মাহত। তুমি বর প্রার্থনা করো। আমি তোমায় বর দিতে চাই।

বিপদ থেকে মুক্তির পথ দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো দ্রৌপদী। একবার ভাবলে, এতক্ষণ নীরবে উচ্ছৃঙ্খল পুত্রদের হাতে কুলবধূর লাঞ্ছনার কথা শুনেও নীরব থাকার পর মহিষীর ভর্ৎসনায়, কুলনাশের আশঙ্কায় যে ধৃতরাষ্ট্র তাকে সন্তুষ্ট করতে চাইছেন তাঁর কাছ থেকে কোনো বর না চাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এখনো তাঁর স্বামীরা দুর্যো-ধনের দাস হয়ে আছেন। অন্তত তাঁদের মুক্ত করার এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। তাই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শ্বশ্রূমাতা গান্ধারীকে প্রণাম করে ধীর স্বরে বললে—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যদি বরদানে অভিলাষী হন, তবে

ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিন। আমার পুত্রদের যেন কোনোদিন দাস-পুত্র হতে না হয়।

ধৃতরাষ্ট্র খুশি হয়ে বললেন—সৌভাগ্যবতী, তুমি যা চাও, তাই হোক। ভদ্রে, তোমাকে আমার দ্বিতীয় বর দিতে ইচ্ছা করছে।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে মুক্ত করার পর আবার প্রার্থনার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলো দ্রৌপদী, বললে—হে রাজন্, আমার বাকি চারজন স্বামীও অস্ত্র-শস্ত্র সহ দাসত্ব থেকে অব্যাহতি পান।

—বৎসে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক। তুমি মূর্তিমতী কল্যাণী। দুটি মাত্র বর দিলে তোমার যথার্থ মর্যাদা রক্ষা হয় না। তুমি তৃতীয় বর গ্রহণ করো। ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জেনেও আর কোনো প্রার্থনা না জানিয়ে দ্রৌপদী বললে—মহারাজ, আর বরে প্রয়োজন নেই। আপনার অনুগ্রহে আমার পঞ্চপতি মুক্তি পেয়েছেন। আপন পুণ্য কর্মবলেই তাঁরা মঙ্গল লাভ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

দ্রৌপদীর গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন কর্ণ। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি শাণিত ব্যঙ্গবর্ষণেও বিরত হলেন না। বাঁকা হাসি ফুটলো তাঁর মুখে। বললেন—পাণ্ডবেরা ভাগ্যবান বলেই এমন গুণবতী ভার্যা লাভ করেছেন। আজ ভার্যাই তাঁদের রক্ষা করলেন আজীবন দাসত্বের অবমাননা থেকে। আমার মনে হচ্ছে, অপবাদ সমুদ্রে তাঁরা ডুবতে বসেছিলেন। ভাগ্যক্রমে পাঞ্চালী তাঁদের পার করলেন।

কর্ণের বাক্যবাণে ভীমসেনের যেন গাত্রদাহ হলো। সক্রোধে সমবেত শত্রু বিনাশে উদ্যত হলেন। অর্জুনও তাঁকে শান্ত করতে পারলেন না দেখে যুধি-ষ্ঠির তাঁর বাহু দুটি জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন ভীমসেনকে। এতক্ষণ ঘটনাবলীর নীরব দর্শক থাকার পর এবার মুখ তুললেন যুধিষ্ঠির। ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে বললেন—মহারাজ, আমরা আপনার আজ্ঞাবাহক। এখন আমাদের কি করা কর্তব্য নির্দেশ দিন অনুগ্রহ করে।

যুধিষ্ঠিরের বিনয়ে খুশি হয়ে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বৎস, তুমি প্রকৃতই ধার্মিক, বুদ্ধিমান। আমার আদেশে তোমরা সকলে ধনরত্ন, দাসদাসী সব নিয়ে

স্বরাজ্যে ফিরে যাও। সেখানে সুখে রাজত্ব করো। তুমি সাধু প্রকৃতি-সম্পন্ন। দুর্বিনীত দুর্যোধনের নিষ্ঠুরতা ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করো। তোমাদের মঙ্গল হোক।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ পেয়ে পাণ্ডবেরা সানন্দে রথে উঠলেন। তাঁদের হাসি-মুখে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে দেখে দুর্যোধন নিজেকে পরাজিত মনে করে ক্ষুণ্ণ মনে শকুনির স্মরণাপন্ন হলেন। সঙ্গী দুঃশাসন আক্ষেপ করে বললেন—হায়। হায়, মাতুল। মতিচ্ছন্ন না হলে বিদুরের কথায় নিজেদের সর্বনাশ এইভাবে কেউ ডেকে আনতে পারে! কেমন কায়দা করে সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে ওদের শেষ পর্যন্ত দাসদাসীতে পরিণত করলাম আমরা। আর ঐ বুড়ো কিনা সব ভেস্তে দিলেন। এ যে তীরে এসেও ভরাডুবি হতে হলো! মাতুল, আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। এমন একটা কৌশল করুন যাতে বাছাধনরা আর না রক্ষা পায়।

শকুনি অনেক ভেবে চিন্তে দুর্যোধনকে তালিম দিয়ে পাঠালেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের পা জড়িয়ে ধরে বললেন—পিতা, ক্রুদ্ধ পাণ্ডবদের আপনি কি মুক্তি দিলেন তাদের হাতে আমাদের সবংশে নিধনের সংবাদ শোনার অপেক্ষায়?

ধৃতরাষ্ট্র চমকে উঠে বললেন—কি বলছো তুমি! পাণ্ডবেরা মুক্তি পেয়ে খুশিই হয়েছে। তারা ক্রুদ্ধ হয়েছে কে বললো তোমাকে?

দুর্যোধন বললো—না, মহারাজ, খুশি যে তারা হয় নি তা আমরা ভালো করেই বুঝতে পেরেছি। অর্জুন যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে গাণ্ডীব তুলে ধরে তূণ দুলিয়ে দেখাতে দেখাতে গেছে কিভাবে আমাদের শরবিদ্ধ করবে। ভীম তার বিশাল গদা ঘুরিয়ে আমাদের মস্তক চূর্ণ করার ইঙ্গিত করেছে। নকুল আর সহদেব তরবারি বারবার কোষমুক্ত করে তাদের অভিসন্ধি বুঝিয়ে দিয়েছে। বিষধর সাপকে শুধু দলিত করে ছেড়ে দেওয়া আর এই পাণ্ডবদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া—দুই-ই সমান। এখন আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

শঙ্কিত ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের হাত ধরে তুলে মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন—

কিন্তু আমি তো তাদের ফেরানোর আর কোনো উপায় দেখছি না, বৎস।
আশান্বিত দুর্যোধন আর দেরী না করে বলে ফেললে—পিতা, এখনো উপায় আছে। আপনি সম্মতি দিলে আমরা এবার নতুন পণে তাদের পরাজিত করে একেবারে নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করতে পারি।
ধৃতরাষ্ট্র আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি পণ?
দুর্যোধন উৎসাহের সঙ্গে বললো—যারা পাশায় পরাজিত হবে তাদের সব ত্যাগ করে মৃগচর্ম পরিধান করে বারো বৎসর বনবাস করতে হবে। বনবাসের পরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। সে সময় যদি তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে আবার বারো বৎসর বনবাস করতে হবে।
মহারাজ, আপনি তো জানেন যে, মাতুলের আহ্বানে তাঁর সঙ্গে খেলতে বসলে যুধিষ্ঠির অবশ্যই পরাজিত হবে আর পাণ্ডবদের বনবাসে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। বারো বৎসর রাজত্ব করার সুযোগ পেলে তাদের সব সৈন্যসামন্ত, অনুচর-পরিজনদের আমরা অনায়াসে বশীভূত করতে পারবো। যদি তারা এরপর ফিরেও আসে তবে আমাদের কাছে নির্ঘাৎ পরাজিত হবে। তাই বলছি, মহারাজ, অনুগ্রহ করে আপনি পাণ্ডবদের আবার পাশা খেলার আহ্বান জানান।
দুর্যোধনের কথা ধৃতরাষ্ট্রের মন্দ লাগলো না। মনে মনে পুত্রের কূটবুদ্ধির তারিফও করলেন। বিদুরকে আর না পাঠিয়ে প্রতিকামীকে ডেকে আদেশ দিলেন—পাণ্ডবদের বলো অবিলম্বে ফিরে এসে আবার পাশা খেলায় যোগ দিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে গান্ধারী ব্যাকুল হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এসে বললেন—মহারাজ, আপনি প্রাজ্ঞ। আপনি কি ভুলে গেছেন এই দুরাত্মা জন্মকালেই শিবার ন্যায় বিকৃত স্বরে কেঁদে উঠেছিল? তখনই দৈবজ্ঞরা বলেছিলেন এই পুত্র কুলনাশক হবে। দুর্লক্ষণগ্রস্ত পুত্রকে ত্যাগ করতে বলেছিলাম। আপনি স্নেহবশে আমার কথা শোনেন নি। এখন যদি তার কথামত পাণ্ডবদের আবার ফিরিয়ে আনেন তাহলে সংবংশে নিধনের পথ প্রশস্ত হবে।
বিব্রত ধৃতরাষ্ট্র আত্মসমর্থনের চেষ্টায় বললেন—মহিষী, তুমি জানো না,

পাণ্ডবেরা যাওয়ার সময় তোমার পুত্রদের বধ করার সংকল্প ব্যক্ত করেছে। তাদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই দুর্যোধন আবার পাশা খেলায় আহ্বানের কথা বলছে।

ক্রোধে যেন গর্জন করে উঠলেন গান্ধারী—মিথ্যা কথা। কে বলেছে পাণ্ডবেরা যুদ্ধের ইঙ্গিত করে গেছে! আপনার ব্যবহারে তারা সন্তুষ্ট, শান্ত হয়ে ফিরে গেছে স্বরাজ্যে। এখন আবার অন্যায় পাশা খেলার আদেশ দিলে তাদের প্রশমিত ক্রোধ বায়ু তাড়িত বহ্নির মতো দাবানল সৃষ্টি করবে। আপনার অন্য পুত্রদের রক্ষা করার জন্য ঐ কুলাঙ্গারকে আপনি সংযত করুন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—আমি দুর্যোধনকে বারণ করতে পারছি না। ওদের যা ইচ্ছা তাই হোক। পাণ্ডবেরা আবার ফিরে এসে পাশা খেলায় যোগ দিক। তারপর যা ভাগ্যে আছে তাই ঘটবে।

১৭

প্রতিকামীর মুখে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ শুনে অনিচ্ছুক হয়েও যুধিষ্ঠির আবার ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। পাশা খেলতে বসেই শকুনি নতুন পণের কথা বললেন সবিস্তারে। তারপর খেলা শুরু হতে না হতেই শেষ। পরাজিত যুধিষ্ঠির পণ অনুসারে বন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন ভায়েদের। মৃগচর্মধারী পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর ত্যাগে উদ্যত দেখে দুঃশাসন আর থাকতে পারলে না। দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বললে—পাঞ্চালী, তোমার পঞ্চপতির এখন বড়ই দুঃসময়। সর্বহারা, বনবাসী পতিদের ভজনা করে কোনো লাভ নেই। এখনো সময় আছে। এখানে যাঁরা রয়েছেন সেই কুরুবংশীয়দের যে-কোনো একজনকে পতিরূপে গ্রহণ করো। বনবাসের দুঃখকষ্ট থেকে রেহাই পাবে।

কটুবাক্যের কশাঘাতে ভীম ক্রোধে আরক্ত হয়ে দুঃশাসনের সামনে গিয়ে বললেন—খল ! এখনো তোর উপযুক্ত শিক্ষা হয় নি। তুই যেমন বাক্য-বাণে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছিস তেমনি যুদ্ধে আমি তরবারি দিয়ে তোর মর্ম বিদ্ধ করবো। তোর উষ্ণ রক্ত পান করবো অঞ্জলি ভরে।

দুর্যোধন পেছন থেকে ভীমসেনের চলার ভঙ্গি অনুকরণ করে দেখালেন। বক্রদৃষ্টিতে তা দেখে দুর্যোধনের দিকে ফিরে ভীম আবার বললেন—নির্বোধ ! গদাঘাতে তোর উরু ভঙ্গ করে পদাঘাত করবো তোর মস্তকে।

অর্জুনও মুখ খুললেন। বললেন—আমি ঐ কটুভাষী, পরশ্রীকাতর নারীর অসম্মানকারী গর্বোদ্ধত কর্ণকে বধ করবো।

নকুল বললেন—যারা দুর্যোধনের কথায় পাঞ্চালীকে ব্যঙ্গ করেছে, আমিও তাদের প্রাণনাশ করবো।

শেষে সহদেব বললেন—শকুনি নির্ঘাৎ আমার হাতেই নিহত হবে।

যুধিষ্ঠির বিন্দুমাত্র উষ্মা প্রকাশ না করে বিনীত কণ্ঠে বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন কুরুবৃদ্ধদের কাছে। ভীম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ প্রভৃতি লজ্জায় মাথা নিচু করলেন। পাণ্ডবদের কল্যাণ কামনা করলেন মনে মনে। বিদুর শুধু মুখ খুললেন। বললেন—যুধিষ্ঠির, আপৎকালে সব দিক বিবেচনা করেই কাজ করো। তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জন্মাতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ থেকো। আর্যা কুন্তীর জন্য কোনো চিন্তা করো না। তিনি আমার গৃহেই থাকবেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করে গান্ধারী ও কুরু-বধূদের কাছে বিদায় চাইল পাঞ্চালী। গান্ধারী সজল চোখে আশীর্বাদ করলেন। কুরুবধূগণও সাশ্রু-নয়নে দুর্যোধন-দুঃশাসনের অপকর্মের নিন্দা জানালে। আলুলায়িত কেশে মুখ আবৃত করে পথে নামলো পাঞ্চালী পঞ্চপতির সঙ্গে।

১৮

নৈব মে পতয়ঃ সান্তি ণ চ পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতারো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন॥
যে মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈরুপেক্ষধ্বং বিশোকবৎ।
ন চ মে শাম্যতে দুঃখং কর্ণো যৎ প্রহিসৎ তদা॥
চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যসঃ।
সম্বন্ধাদ্ গৌরবাং সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব॥

পুরবাসীরা কাঁদতে কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। যুধিষ্ঠির অনেক বুঝিয়ে তাঁদের ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেন। একদল ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই পাণ্ডবদের সঙ্গত্যাগে স্বীকৃত হলেন না। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির উত্তর দিকে চলা শুরু করলেন। সারাদিন চলার পর সায়াহ্নে গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষের তলে সেদিনের মতো বিশ্রাম। পরদিন প্রভাতে পুরোহিত ধৌমের উপদেশে যুধিষ্ঠির সূর্যের আরাধনা করলেন ব্রাহ্মণদের ক্ষুধাব অন্ন প্রার্থনায়। সারাদিন আরাধনার পর সন্ধ্যার সময়ে নির্জন গঙ্গাতীরে ধ্যানমগ্ন যুধিষ্ঠিরের সামনে উপস্থিত হলেন এক সৌম্য ব্রাহ্মণ। নিজেকে সূর্যের উপাসক বলে পরিচয় দিলেন যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে। বললেন—মহারাজ, আপনি সূর্যদেবের উপাসনা-রত তাই আপনাকে একটি ভোজন পাত্র দিতে চাই। যতক্ষণ আপনার ভার্যা অভুক্ত থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাত্রে রাখা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শূন্য হবে না। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

রাত্রি শেষে আবার শুরু হলো পথ পরিক্রমা। দিন শেষে তারা উপস্থিত হলেন সরস্বতী তীরবর্তী কাম্যক বনে। অসংখ্য গাছ-গাছলির আর অজস্র ফলমূলে সমাচ্ছন্ন সেই বনভূমির রমণীয় নিভৃতি সকলকেই মুগ্ধ করলে। পাখ-পাখালির কাকলী আর ঝরণার কলতান শুনে পাঞ্চালীর

মন খুশিতে ভরে উঠলো। তপস্বীদের কুটিরের কাছাকাছি নীড় বাঁধার অনুরোধ জানালে পতিদের। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে বনজ সামগ্রীর সাহায্যে ছোট ছোট কুটির তৈরি করলেন অনুজেরা।

বেশ শান্তিতে কাটছিল দিন। একদিন ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও পঞ্চাল বংশীয় বীরদের সঙ্গে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন সেখানে। রাজসিংহাসনের অধিকারী পাণ্ডবদের বনবাসী দেখে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সেই মহাযুদ্ধে দুরাত্মা দুর্যোধন ভায়েদের সঙ্গে নিশ্চয়ই নিহত হবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমরা অবশ্যই রাজ্যেশ্বর রূপে দেখতে পাব।

যুধিষ্ঠির সসম্মানে কৃষ্ণ ও তাঁর সহগামীদের অভ্যর্থনা জানালেন। পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করলে পাঞ্চালী। পর্ণপাত্রে সাজিয়ে দিলে ফলমূলাদি।

রাজ-নন্দিনী, রাজকুলবধূ দ্রৌপদীকে বনবালার সাজে স্বহস্তে ফলমূল আনতে দেখে কৃষ্ণ তাকালেন তার দিকে। একটা বেদনাহত ক্ষুব্ধ দৃষ্টি যেন তাঁর মর্মবিদ্ধ করলে। মুখ ফুটে না বললেও তার চোখ যেন বললে—সখা, সেই তুমি এলে কিন্তু এত দেরিতে যে তোমার আসার আগেই নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা ঘটে গেল!

গভীর বেদনায় আপ্লুত কণ্ঠে কৃষ্ণ ডাকলেন—কৃষ্ণা, সখি। এতক্ষণ কোনোরকমে ভাবাবেগ দমন করেছিল পাঞ্চালী। কৃষ্ণের ডাকে রুদ্ধ আবেগ যেন মুক্তি পেল।

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন—সখা, পাণ্ডব-ভার্যার লাঞ্ছনার আরও কত বাকি বলতে পারো? রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু পঞ্চ বীর পতির চোখের সামনেই নারীত্বের চরম অপমান ঘটালে দুর্যোধন আর দুঃশাসন। ধর্মভীরু যুধিষ্ঠির এতই পাশা-সক্ত হলেন যে, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ রাখতে দ্বিধা করলেন না। আর আমার অন্য পতিরা জ্যেষ্ঠের ধর্ম রক্ষার ধ্বজাবাহক সেজে নিজেদের ভার্যার দুর্বৃত্ত হস্তে লাঞ্ছনা সহ্য করলেন অম্লানবদনে! আর সেই মুহূর্তে যাঁকে আমি ব্যাকুল হয়ে খুঁজেছি আমার সেই প্রাণ-সখাও এলেন না

আমার রক্ষাকর্তা হয়ে।

ক্ষণিক বিরতির পর আবার বললো—বাসুদেব, তাই বলছি শোনো। আমার পিতা নেই, মাতা নেই, ভ্রাতা নেই, পতি নেই। কেউ নেই আমার। আমি ভাগ্যহতা, নিঃসঙ্গ। সখা, আজ তুমি বনবাসী কৃষ্ণাকে দেখতে এসেছো। সত্যিই যদি সখির প্রতি তোমার একটুও মমতা থাকতো তাহলে কি আমার চরম বিপদের সময় দূরে থাকতে পারতে?

কৃষ্ণ বললেন—সখি, সত্যিই আমি তোমার কাছে অপরাধী। অপরাধী পাণ্ডবদের সকলের কাছেই। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তখন দ্বারকাতেই ছিলাম না। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ শেষে দ্বারকাতে ফিরে গিয়ে দেখি শিশুপালের ভাই, জরাসন্ধের বন্ধু, মার্তিকা দেশের রাজা শাল্ব বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে দ্বারকা বিধ্বস্ত করে গেছে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে আমি শাল্বের খোঁজে ছুটে যাই অনর্ত-দেশে। মায়াবী যোদ্ধা শাল্বের রথ তখন সমুদ্রের ওপরে। আমি মুহুর্মুহু শরবর্ষণ করতে লাগলাম। কিন্তু সে অক্ষত রয়ে গেল। তারপর ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। আমি সেই মায়াবীর মায়াজাল ব্যর্থ করে সুদর্শন-চক্র নিক্ষেপ করে শেষ পর্যন্ত তাকে বধ করলাম। তারপর দ্বারকায় ফিরে এসে সাত্যকির কাছে দ্যূতসভার সব বিবরণ শুনে তোমাদের খোঁজে সকলকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। একথা ঠিক যে, দ্যূতসভায় উপ-স্থিত থাকলে আমি কিছুতেই ঐ অন্যায় দ্যূতক্রীড়া হতে দিতাম না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করতে পারলে ঐ কুলাঙ্গার দুর্যোধন-দুঃশাসন আর তাদের কুচক্রী মাতুলকে নিশ্চয় যমালয়ে পাঠাতাম।

এখন বুঝতে পারছি আমরা সবাই দৈবাধীন। দৈবের বিধানেই কুরুকুল ধ্বংসের জন্যই তোমাদের এই সাময়িক নিগ্রহের হয়তো প্রয়োজন ছিল। কৃষ্ণার লাঞ্ছনাই প্রমাণ করছে, পাণ্ডবদের হাতে কুরু-কুলাঙ্গারদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সখি, তোমার অশ্রুপাত বৃথা যাবে না। বৃথা যাবে না তোমার অসহায়

আর্তস্বর। আমি সর্বসমক্ষে শপথ করছি, আমার সহায়তায় ভীম-অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে স্বামী-পুত্র-হারা কুলবধূদের চোখে অশ্রুর প্লাবন বয়ে যাবে। সখি, তুমি রাজরাজেশ্বরী হবে।

কৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্যে পাঞ্চালীর অবরুদ্ধ অভিমান ভাষা পায়। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—মাধব, আমি তোমার দোষ দেখি না। আমার ভাগ্য দোষেই হয়তো তুমি সেদিন দ্যূতসভায় উপস্থিত হতে পার নি। কিন্তু আমার মহাবীর পতিগণ সেখানে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। নিজেদের ভার্যাকে যাঁরা দুর্বৃত্তের কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন না, তাঁদের প্রকাশ্যেই নিন্দা করছি আমি।

আর যদি প্রিয়তমা ভার্যাও উপেক্ষিতা হন তবু নিজেদের ঔরসজাত পুত্র-দের জননী হিসাবেও কি তাঁদের উচিত ছিল না আমাকে রক্ষা করা?

কৃষ্ণের চোখের সামনেই অভিমানিনীর উদ্‌গত অশ্রু শুভ্র মুক্তাবিন্দুর মতো রক্তিম গণ্ড বেয়ে পীবর স্তনদুটি সিক্ত করতে লাগলো। সেই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণের হৃদয়ও মথিত হলো এক গভীর বেদনার অনুভূতিতে।

ব্যথাভরা কণ্ঠে কৃষ্ণ বললেন—ভাবিনি, আর অশ্রুবর্ষণ কোর না। যোগ্য শাস্তি পাবে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বিনীত পুত্রগণ।

কৃষ্ণের প্রবোধবাক্যে ভাবাবেগ প্রশমিত হলো। অর্জুনের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হলো। সেই দৃষ্টি যেন শতধা দংশন করলে অর্জুনকে। গম্ভীর স্বরে অর্জুন বললেন—সখা, তুমি যথার্থ কথাই বলেছ। আমি নিশ্চয় পাঞ্চালীর দুর্দশা দেখে ব্যঙ্গকারী কর্ণের শিরশ্ছেদ করবো।

ধৃষ্টদ্যুম্নও বললে—আমার হাতে অবশ্যই নিহত হবেন দ্রোণাচার্য। ভীম সগর্বে বললেন—আমি সাঙ্গ করবো দুর্যোধন আর দুঃশাসনের ভবলীলা।

১৯

তবেমামাপদং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিঞ্চ সুযোধনে।
ধাতারং গর্হয়ে পার্থ বিষমং যোঽনুপশ্যতি ॥
কর্ম চেৎ কৃতমন্বেতি কর্তারং নান্যমৃচ্ছতি।
কর্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নূনমীশ্বরঃ ॥
অর্থ কর্মকৃতং পাপং ন চেৎ কর্তারমৃচ্ছতি।
কারণং বলমেবেহ জনান্ শোচামি দুর্বলান ॥

কাম্যকবনে তাঁদের উপস্থিতি ও অবস্থানের সংবাদ শত্রুপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ার সংবাদ পেয়ে পাণ্ডবেরা সেখানে বেশিদিন থাকা সঙ্গত মনে করলেন না। ধৌমের নির্দেশে তাই আবার শুরু হলো পথচলা। পরিশেষে সকলে উপনীত হলেন এক নির্জন মহারণ্যে। ধৌম জানালেন এই মহাবনের নাম দ্বৈতবন। এই বনের শোভা যেমন মনোরম, এখানে মৃগয়ার উপযুক্ত জীব-জন্তুও তেমন সুপ্রচুর। সুতরাং এই মহারণ্যই তোমাদের নিরাপদ আশ্রয় হোক।

অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে এক অনিন্দ্য সরোবর-তীরে মুনি-ঋষিদের কয়েকটি পর্ণকুটির দেখা গেল। সেখানেই কুটির বাঁধলেন পাণ্ডবেরা শাল, তমাল, সর্জ, অর্জুন, কর্ণিকা বৃক্ষাদির অন্তরালে। বর্ষা সমাগমে নানা ফুলের শোভায় বনস্থলী অপরূপ রমণীয় হয়ে উঠলো। অতিথিসেবা আর পতিদের পরিচর্যার অবসরে বৃক্ষশাখায় কোকিল-ডাহুকের বিচিত্র মধুর সুরধ্বনি আর সরোবরে মদমত্ত হস্তীযুগলের জলকেলি দেখেই দিন কেটে যায় পাঞ্চালীর। সন্ধ্যায় ঋষি-কুটিরে সন্ধ্যাবন্দনা, বেদমন্ত্রধ্বনি সমাহিত মনকে ইষ্টাভিমুখী করে তোলে।

মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে। ক্ষোভ জাগে মনে। বুঝতে পারে এ ক্ষোভ শুধু তারই নয়, নিত্যদিন ফল-মূলাদি আহরণে ক্লান্ত চার পতিও সহ্য করতে পারেন না এই বনবাস। কিন্তু আশ্চর্য হয় যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করে। ইন্দ্র

প্রস্থের রাজা যুধিষ্ঠির আর বনবাসী যুধিষ্ঠিরের আচার-আচরণ, মনোভাবে কোনোও পরিবর্তন চোখে পড়ে না। ভাবে, যুধিষ্ঠির কিসত্যি সুখের বিগত-স্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন কোনো তাপস না মনুষ্যপদবাচ্য এমন কোনো প্রাণী, যার মন নেই, বোধ নেই। নেই আবেগ-অনুভূতি, ক্রোধ, ঘৃণা, ভাল-বাসা, কোনোও মানবিক প্রতিক্রিয়া।

ভাবতে ভাবতে ক্রোধের সঞ্চার হয় মনে। একদিন সকলের সামনেই পাঞ্চালী প্রশ্ন করে—মহারাজ, আপনার প্রাণাধিক অনুজদের নিত্যদিন এত কৃচ্ছ্রসাধনে রত দেখে আপনার কি দুর্যোধন-দুঃশাসন-শকুনির প্রতি কোনো ক্রোধের সঞ্চার হয় না ? আমি জানি, ক্রোধ আর অক্ষমা ক্ষত্রিয়ের সহজাত। শত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শনের মতো কোনো দুর্বলতা ক্ষত্রিয়ের শোভা পায় না।

ক্ষণিক বিরতির পর উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাঞ্চালী আবার বলে—আমি অবশ্য এমন কথা বলি না যে, আপনি অকারণেই ক্রোধ প্রকাশ করুন। কিন্তু অপাত্রে ক্ষমা প্রদর্শন কি দুর্বলতার নামান্তর নয় ?

যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হয়ে বললেন—পাঞ্চালী। মহাপুরুষরা বলেন, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, বেদ আর শাস্ত্রজ্ঞান। যে প্রকৃতই ক্ষমাশীল সে সবই ক্ষমা করতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরিশেষে ক্ষমার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে আমার ন্যায্য রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দেবেন। আর যদি লোভের বশে সেটুকুও না করেন তাহলে সবংশে বিনষ্ট হবেন।

ক্ষমার মাহাত্ম্য পাঞ্চালীর সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়। শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—দৈব প্রতিকূল না হলে বোধহয় আপনার মুখে একথা শুনতে হতো না। ধর্মকে অপেক্ষা শ্রেয় মনে করেই আজ অশেষ দুঃখ-ভোগ করছেন সকলে। একটা কথা কিন্তু না জিজ্ঞাসা করে পারছি না। ধর্মরাজ, নীতিগত ভাবে অন্যায় আর পরিণামে দুঃখকর জেনেও আপনি কি করে পাশাসক্ত হয়েছিলেন বলতে পারেন ? আপনার ধর্মাচরণ আর দুর্যোধনের অধর্মাচরণের বিপরীত ফল দেখেও কি আপনি বিধাতার

নিরপেক্ষতায় আস্থা রাখতে পারেন ?

যুধিষ্ঠির অবিচলিত থেকেই বললেন—কৃষ্ণে, আমি ধর্মের ফল অন্বেষণ করতে শিখি নি। যা করা ধর্মোচিত তাই শুধু করি। তুমি যেন নাস্তিকের মতো কথা বললে!

পাঞ্চালী মাথা নেড়ে বললে—মহারাজ, আমি নাস্তিক নই। দেব-দ্বিজে আমি ভক্তিমতী। কিন্তু যাঁরা সবই দৈবাধীন বলে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট থাকেন, আমি সেই ধর্মাত্মাদের সমর্থন করি না। দৈব অবশ্যই প্রবল কিন্তু পুরুষকারও তুচ্ছ নয়। বরং পুরুষকারই দৈবের অপেক্ষিত। পুরুষকারকে বিসর্জন দিয়ে নিষ্ক্রিয়তাকেই যাঁরা দৈব-আনুগত্য বলে জ্ঞান করেন, তাঁদেরও আমি সমর্থন করি না। আমার তাই বিনীত অনুরোধ এই যে, যথা সময়ে যথাকর্তব্যে অনুপ্রাণিত হোন।

যুধিষ্ঠির কিছু বলার আগেই ভীমসেনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—মহারাজ, অনুজের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। দ্যূতসভায় আমাদের প্রিয়তমা ভার্যা পাঞ্চালীর চরম লাঞ্ছনা, আকুল আবেদন শুনেও আপনি নিরুত্তর ছিলেন বলে আমি ক্রোধের বশে আপনার পাশাসক্ত হাত দুটি দগ্ধ করতে চেয়েছিলাম। আজ শান্ত চিত্তেই বলছি, আমার সে ক্রোধ অপাত্রে ও অসময়ে প্রকাশ পেয়েছিল বলে মনে করি না। আজও আমি আপনার ভাবলেশহীন মুখে ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনে ক্রোধ দমন করতে পারছি না।

মহারাজ, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে আপনার দুর্মতির জন্যই পাঞ্চালীর যত লাঞ্ছনা আর দুরবস্থা। আমাদের দুর্গতির কারণও আপনার পাশাসক্তি। প্রাজ্ঞবর, সময়োপযোগী কাজ যেমন ধর্মবিরহিত নয়, তেমনি নিষ্ক্রিয়তাও ধর্মসম্মত হতে পারে না। মহারাজ, আপনি ক্ষাত্রধর্মে উদ্বুদ্ধ হোন। আমরা সকলে মিলে দুর্যোধনদের বিনষ্ট করি।

ভীমসেনের বাক্যবাণে দুঃখিত যুধিষ্ঠির বললেন—ভরত-নন্দন, তোমার বাক্য শলাকার মতো আমাকে বিদ্ধ করলেও আমি স্বীকার করছি তোমার অভিযোগ। তাই নিষ্ঠুর কথা বলার জন্য তোমাকে দোষ দিতে চাই না।

আমার বুদ্ধির দোষেই তোমাদের কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করো ভাই, পাশায় আসক্তিবশে নয়, কুটিল দুর্যোধনের সমস্ত রাজ্য বিনা রক্তপাতে জয় করবো মনে করেই খেলার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজে না খেলে শঠ শকুনিকে বসিয়ে আমায় প্রবঞ্চিত করেছে। প্রথম পরাজয়ে ক্রোধের বশেই আমি জ্ঞানহারা হয়ে একে একে সব হারিয়ে বসলাম। আজ মনে হচ্ছে সেটাই ছিল ভবিতব্য! দৈববশেই আমরা দাস হয়েছিলাম আর দৈববশেই পাঞ্চালী আমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। এত কাণ্ডের পরেও আবার কেন খেলার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি তাও তোমাদের অজ্ঞাত ছিল না। তখন কেন তোমরা সকলে জোর করে আমায় নিবৃত্ত করলে না, বলতে পারো?

ভীমসেন ততক্ষণে নিজেকে কিছুটা সংযত করলেও শ্লেষভরা কণ্ঠেই বললেন—মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ সন্তানের মতো আচরণ করছেন বলেই বুঝতে পারছেন না যে, আমরা সকলেই যুদ্ধের জন্য আগ্রহী। কেন যে আপনি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মেছিলেন জানি না! ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিলে জপ-তপ করে এতদিনে মোক্ষ লাভ করতে পারতেন!

মাত্র তের মাসের বনবাসেই আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভেবে দেখুন, এর বারো গুণ অর্থাৎ তের বৎসর ধরে এই কষ্ট সহ্য করা কার পক্ষে সম্ভব? আর তার প্রয়োজনও তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস কালে যে আবার বারো বৎসর বনবাসের ব্যবস্থা হবে না তাও কি আপনি বলতে পারেন?

একটু আগে আপনি বললেন যে, সেদিন দৈববশেই পাঞ্চালী আমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয় কোনো দৈব নয়, পাঞ্চালী উপস্থিত বুদ্ধি আর শারীরিক শক্তিবলেই পাপিষ্ঠ দুঃশাসনকে প্রতিহত করেছিলেন। আমাদের মুক্তির ব্যাপারেও তার প্রখর উপস্থিত বুদ্ধিই কাজে এসেছিল। গোটা ব্যাপারটা প্রমাণ করে পাঞ্চালীর অসামান্যতা আর আমাদের অমার্জনীয় নিষ্ক্রিয়তা। সুতরাং এই নিষ্ক্রিয়তা বর্জন করে যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত হওয়াই আমাদের আশু কর্তব্য।

উত্যক্ত হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন—হে বাক্যবাগীশ! যুদ্ধের জন্য ব্যাকুলতার কারণ তোমাদের মানসিক উত্তেজনা। কিন্তু জেনে রাখ যে, শুধু উত্তেজন আর সাহস নিয়েই রাজ্যজয় করা যায় না। তোমরা নিঃসন্দেহে সাহসী ও বীর কিন্তু ভুলে যেও না যে সংখ্যায় তোমরা মুষ্টিমেয়। তোমরা সহায়ত পেতে পার কেবল পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদ আর কৃষ্ণের নেতৃত্বাধীন বৃষ্ণি ও অন্ধক বীরদের। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছ ইতিমধ্যে দুর্যোধনে শক্তি ও লোকবল কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে? সে প্রভূত অর্থ ও নান সামগ্রী উপহার দিয়ে আমাদের হিতৈষীদেরও বশ করেছে বলে আমি সংবাদ পেয়েছি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি অজেয় বীরগণ দুর্যোধনের অন্নেই পালিত হচ্ছেন বলে যুদ্ধের সময় তার পক্ষই অবলম্বন করবেন আমাদের উপর স্নেহ-মমতা থাকা সত্ত্বেও। পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ কর্ণ অমিত পরাক্রমশালী মহারথ। আমাদের বিরুদ্ধে দুর্যো ধনের প্রধান সহায় হবেন তিনি। এই সম্মিলিত প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে দীর্ঘ সময় ও ব্যাপক প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক সুতরাং বর্তমানে ধৈর্য ধারণ করাই আমি শ্রেয় মনে করি।

যুধিষ্ঠিরের যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে ভীমসেন চুপ করে রইলেন অর্জুন, নকুল, সহদেবও সমর্থন করলেন অগ্রজের বক্তব্য। সেই অস্বস্তি কর পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হলেন মহাযোগী বেদব্যাস। যুধিষ্ঠিরকে ইশারায় একান্তে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে বিদায় নিলেন।

যুধিষ্ঠির ফিরে এসে বললেন—মহর্ষি বলে গেলেন যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে নানা দিব্যাস্ত্র চাই আর সেজন্য অর্জুনকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। অর্জুন সম্মত হয়ে যাত্রার উদ্যোগে তৎপর হলেন।

অর্জুন তপস্যার জন্য বিদায় নিলে যুধিষ্ঠির যাজ্ঞসেনীকে ও তিন ভাইকে নিয়ে লোমশ মুনির সঙ্গে তীর্থ দর্শন করতে বের হলেন। অনেক দিন পরে নানা দিব্য অস্ত্র লাভ করে অর্জুন আবার ফিরে এলেন। এদিকে বছরের পর বছর পাণ্ডবদের নিত্য মৃগয়ার ফলে দ্বৈতবন প্রায় মৃগ

শূন্য হয়ে পড়লো। মৃগয়ার স্বার্থে দ্বৈতবন থেকে তাঁরা আবার ফিরে গেলেন কাম্যক বনে। কাম্যক বনে ততদিনে মৃগের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মহানন্দে মৃগয়া করতে শুরু করলেন পাণ্ডবেরা। এইভাবে এগারোটি বৎসর কাটলো বনে বনে।

২০

কোটিকাম্য বচঃ শ্রুত্বা শৈব্যং সৌবীরকোঽব্রবীৎ।
যদা বাচং ব্যাহরন্ত্যাসম্যাং মে রম্যতে মনঃ॥
সীমন্তিনীনং মুখ্যায়ং বিনিবৃত্তঃ কথং ভবান্।
এতাং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়োমেঽন্যা যথা শাখামৃগস্ত্রিয়ং।
প্রতিভান্তি মহাবাহো। সত্যমেতদব্রবীমিতে॥

*   *   *

বিবাহার্থো ন মে কশ্চিদিমাং প্রাপ্যাতি সুন্দরীম্।
এতামেবাহমাদায় গমিষ্যামি স্বমালয়ম্॥

প্রতিদিনের মতো সেদিনও কুটিরে ধৌমের কাছে পাঞ্চালীকে রেখে পঞ্চ-পাণ্ডব বের হলেন মৃগয়ায়।

দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। কুটির থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণের কদমগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল পাঞ্চালী। উদাস দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। মনে জাগছে কত কথা। নিজের পাঁচটি সন্তানের স্নেহার্তমুখগুলি বার বার মনে পড়ছিল। দীর্ঘ এগারটি বৎসর পার হয়ে গেলেও তাদের চোখের দেখাও মেলেনি। বেদনায় ভরে ওঠে মন।

কে জানে কেমন আছে তারা দ্বারকায়! সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যুকে খেলার সাথী পেয়ে হয়ত অভাগিনী মায়ের কথা ভুলেই গেছে এতদিনের অদর্শনে।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অনুগত কয়েকজন রাজপুত্র ও বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে

শাল্বরাজ্যে যাচ্ছিলেন বিবাহের উদ্দেশ্যে। পথে কাম্যক বন দেখে ঢুকলেন বিশ্রামের জন্য। ঘুরতে ঘুরতে দূর থেকে পাণ্ডবদের কুটির দেখতে পেয়ে সেদিকেই আসছিলেন। কুটিরের বাইরে কদমগাছের তলায় ভাব-বিভোর পাঞ্চালীকে দেখে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে ছিলেন রাজা কোটিকাম্য। তাঁর গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে জয়দ্রথ বলে উঠলেন—বন্ধু, আজ আমার চক্ষু সার্থক হলো এই অনবদ্য-যৌবনাকে দেখে। এঁকে পেলে আর শাল্বরাজ্যে না গিয়ে নিজের রাজ্যেই ফিরে যেতে পারি। তুমি আমার হয়ে সুন্দরীর সম্মতি নিয়ে এসো।

পাঞ্চালীকে দেখে কোটিকাম্যও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু জয়দ্রথের মনোবাসনা শুনে একটা হতাশার শ্বাস ফেলে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। পাঞ্চালীর সামনে গিয়ে বললেন—এই নির্জন বনে কে তুমি একলা দাঁড়িয়ে আছ? এই কুটির কোন্ তপস্বীর আর সীমন্তিনী তোমার পতিই বা কোন্ ভাগ্যবান জানতে পারি?

কোটিকাম্যর কণ্ঠস্বর শুনে চমক ভাঙলো পাঞ্চালীর। আত্মসংবরণ করে বললে—আমি মহারাজ দ্রুপদের কন্যা। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব আমার স্বামী। তাঁরা সকলেই মৃগয়ায় গেছেন। আপনার পরিচয় পেলে তাঁদের অবর্তমানেও আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হবে না।

কোটিকাম্য চমৎকৃত হয়ে বললেন—আমি সুরথ-রাজপুত্র কোটিকাম্য। আমরা বারোজন রাজপুত্র সৌবীর-রাজ জয়দ্রথের সঙ্গে এখানে উপস্থিত হয়েছি বিশ্রামের উদ্দেশ্যে।

পাঞ্চালী বললে—আপনাদের সকলকেই আতিথ্যগ্রহণের জন্য কুটিরে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

কোটিকাম্যকে সামনে পাঠিয়ে অন্তরালে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে জয়দ্রথ এতক্ষণ তাকিয়েছিলেন পাঞ্চালীর দিকে। মনে হলো যৌবন-সীমা অতিক্রম করলেও এঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌবনের ঐশ্বর্য যেন সংহত হয়ে আছে। তাঁর অন্তঃপুরে যৌবনবতী গৌরাঙ্গী সুন্দরীর অভাব নেই কিন্তু এই শ্যামাঙ্গীর কাছে তাদের বানরী বলেই মনে হয়।

কোটিকামা ফিরে আসা মাত্র দুজন সহচর নিয়ে জয়দ্রথ এগিয়ে গেলেন কুটিরের দিকে। পাঞ্চালী তভক্ষণে অতিথি সৎকারের জন্য প্রস্তুত। জয়দ্রথকে আসতে দেখে পাদ্য-আসন এগিয়ে দিয়ে বললে—রাজপুত্র, আপনাদের প্রাতরাশ হয়েছে কিনা জানি না। তাই মাত্র পঞ্চাশটি মৃগ দিচ্ছি এখন। আমার স্বামীবা ফিরে এলেই আরও নানা পশু দেব আপনাদের পরিতৃপ্তির জন্য।

কামার্ত জয়দ্রথের দৃষ্টি তখন যেন লেহন করতে সুরু করেছিল পাঞ্চালীর সর্বাঙ্গ। আপ্যায়নের আহ্বান কানে যেতে দৃষ্টি না সরিয়ে নরম কণ্ঠে বললেন—সুন্দরী, তোমার দেওয়া প্রাতরাশে আমার অভিরুচি নেই। আমি তোমাকেই চাই। রাজ্যহারা, বনচর পাণ্ডবদের প্রতীক্ষা না করে আমার রথে ওঠো। বনের কুটিরে তোমায় মানায় না। সমগ্র সিন্ধু সৌবীর রাজ্যের অধিশ্বরী হওয়ার যোগ্য তুমি।

জয়দ্রথের কুৎসিত দৃষ্টি পাঞ্চালীও অনুভব করেছিল। কথা শুনে ক্রোধে আরক্তিম আননে তীব্র ভ্রূকুটি ফুটলো। চোখের তারায় বিদ্যুৎ হেনে সদর্পে বলে উঠলো—বিষ্ঠাপ্রিয় কুক্কুরের মনুষ্যোচিত প্রাতরাশে রুচি হবে কেন? তোকে পাদ্য-আসন দেওয়াই ভুল হয়েছে! মূর্খ, এখুনি দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। যদি প্রাণের ভয় থাকে তো অবিলম্বে কাম্যক বন ত্যাগ কর। নচেৎ পাণ্ডবদের ক্রোধ থেকে নিস্তার পাবি না।

জয়দ্রথের লোলুপ চোখ দুটি তাচ্ছিল্যের হাসিতে যেন একটু কুঞ্চিত হলো। অবজ্ঞা ফুটলো কণ্ঠস্বরে।

—কোমলাঙ্গী, তোমার পতিরত্নদের আমি ভাল করেই জানি। তাদের ভয়ে সৌবীররাজ জয়দ্রথ মূর্ছা যায় না। আর দেরী সহ্য করতে পারছি না। রথে ওঠো শীঘ্র। ঐ চারু অঙ্গ স্পর্শ করে ধন্য হই।

পাঞ্চালী গর্জে উঠলো।

—সাবধান জয়দ্রথ। নারীমাত্রেই তোমার অন্তঃপুরিকাদের মতো যে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় না, একথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। পরিণাম ভুলে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না।

অধৈর্য জয়দ্রথ সবেগে এগিয়ে এল পাঞ্চালীকে ধরে রথে তুলতে। মুহূর্তের মধ্যে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী জয়দ্রথের মাথায় পদাঘাত করলে পাঞ্চালী। তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে কুটির থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ধৌম্য। পাঞ্চালী তখন জয়দ্রথের রথে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময়ে হতবাক ধৌম্য কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই পাঞ্চালী তাঁর দিকে তাকিয়ে রহস্যভরা কণ্ঠে বললে—এই কাপুরুষটার সঙ্গেই আমি যাচ্ছি। আমার বীর পতিদের বলবেন, পারলে আমাকে উদ্ধার করতে।

জয়দ্রথও কম বিস্মিত হন নি। যে নারী তাঁকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে মাথায় পদাঘাত করলে সেই আবার স্বেচ্ছায় তাঁর রথে উঠে দাঁড়ালো। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হয় না। মাটি থেকে উঠে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন জয়দ্রথ। মনে হলো যাকে ধরার কথা ভাবা যায় না, নিজের থেকেই সে যখন ধরা দিতে চায় তখন আর বিলম্বে কাজ কি! কোনো দিকে না তাকিয়ে আশা-আনন্দে নেচে জয়দ্রথ নিজের রথে উঠলেন। ধৌম্যের চোখের সামনে দিয়ে পাঞ্চালীকে নিয়ে রথ ছুটিয়ে দিলে জয়দ্রথের সারথি। পাণ্ডবেরা যখন ফিরে এলেন জয়দ্রথের রথ তখন এক ক্রোশ এগিয়ে গেছে। ধৌম্যের কাছে দুর্ঘটনার কথা শোনামাত্র চার ভাই রথে উঠলেন। দূর থেকে তাঁদের আসতে দেখে জয়দ্রথের সৈন্যদল প্রতিরোধে এগিয়ে গেল। অনায়াসে তাদের নির্মূল করে ভীম আর অর্জুন জয়দ্রথের পেছনে ধাওয়া করলেন। অর্জুনের শরাঘাতে রথ ছেড়ে পালাতে গেলেন জয়দ্রথ। ভীমসেন ছুটে গিয়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরলেন। অর্জুন দূর থেকেই বললেন দুরাত্মাকে প্রাণে না মেরে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিন। ভীমসেন ততক্ষণে এক আছাড়ে জয়দ্রথকে মাটিতে ফেলে তার শ্বাসরোধ করার উপক্রম করেছেন। অর্জুনের কথায় একটু বিরক্ত হয়ে জয়দ্রথকে টানতে টানতে রথে তুলে কাম্যক বনে নিয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠিরের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন—এই কামুকটা যদি আজ থেকে আমাদের দাসত্ব করতে রাজী থাকে আর পাঞ্চালী যদি অনুমতি দেয় তাহলে একে ছেড়ে দিতে পারি।

অপাঙ্গে জয়দ্রথকে দেখে কৌতুকের হাসি ফুটলো যাজ্ঞসেনীর মুখে। ভীমসেনকে বললে—বৃকোদর, কাপুরুষটার উচিত শাস্তিই হয়েছে। এখন ওকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়াই ভাল।

জয়দ্রথের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরও হাসতে হাসতে বললেন—নরাধম, এমন কাজ আর করো না। যাও, দাসত্ব থেকে রেহাই দিলাম তোমায়।

২১

নৈবংরূপা ভবন্ত্যেব যথা বদসি ভাবিনি।
প্রেষয়ন্তী চ বৈ দাসীর্দাসাংশ্চ বিবিধান বহুন।
নোচ্চ গুল্‌ফা সংহতোরুস্ত্রিগম্ভীরা ষডুন্নতা।
রক্তপঞ্চষু রক্তেসু হংসগদ্‌গদভাষিণী॥
সুকেশী সুস্তনী শ্যাম পীনশ্রোণিপয়োধরা।
তেন তেনৈব সম্পন্না কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী॥
কা ত্বং ব্রুহি যথা ভদ্রে নাসি কথঞ্চন।
যক্ষী বা যদি বা দেবী গন্ধর্বী যদি বাপ্সরাঃ॥

বনবাসের কাল শেষ। এখন এক বৎসর থাকতে হবে অজ্ঞাত পরিচয়ে। অনেক সলাপরামর্শের পর মৎস্য দেশই উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবেরা উপস্থিত হলেন বিরাটরাজার রাজধানীতে। স্থির হলো তাঁরা প্রত্যেকেই ছদ্মবেশ ও ছদ্মনামে বিরাটরাজার কাছে আশ্রয় চাইবেন। তদনুযায়ী প্রথমে যুধিষ্ঠির গেলেন ব্রাহ্মণ বেশে। রাজসভায় গিয়ে পাশা খেলায় নিজের নৈপুণ্যের কথা জানিয়ে কর্মপ্রার্থী হলেন। মহারাজ বিরাট যুধিষ্ঠিরের নম্র ভংগিতে খুশি হয়ে তাঁকে গ্রহণ করলেন নিজের বয়স্যরূপে।

তারপর ভীম গেলেন বিরাট রাজসভায় পাচক বেশ ধারণ করে। মহা-

রাজকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—আমি বল্লভ। আগে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম। রন্ধনকার্য ছাড়া মাঝে মাঝে মল্লক্রীড়া প্রদর্শন করে মহারাজের আনন্দবর্ধন করতে পারি। মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে পাকশালার পরিচালক নিযুক্ত করলেন বল্লভকে।

কিছুক্ষণ পরে নকুল গেলেন। পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—আমি অরিষ্টনেমি। ইতিপূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গো-শালার পর্যবেক্ষক ছিলাম। এখন আপনার কাছে কর্মপ্রার্থী।

বিরাটরাজার প্রচুর গোসম্পদ। এতদিনে দেখাশোনা করার যোগ্য লোক পেলেন মনে করে নকুলকে পশুপালকদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন। বিরাট রাজসভায় সেদিন যেন বিস্ময়ের অবধি নেই।

আকৃতিতে বলবান যুবকসদৃশ নারীর বেশভূষাধারিণী স্ত্রীলোককে সামনে করযোড়ে দাঁড়াতে দেখে বিরাট অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি আবার কে বাপু? কি চাও আমার কাছে?

অর্জুন পুরুষকণ্ঠ গোপনের কোন চেষ্টা না করেই বললেন—মহারাজ, আমি পুরুষত্বহীন, নৃত্য-গীতপটু বৃহন্নলা। আপনি অনুগ্রহ করে আশ্রয় দান করলে বিনিময়ে আপনার কন্যাকে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিতে পারি।

বিরাট তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন অন্তঃপুরে মহারাজ্ঞীর কাছে। তাঁর সম্মতি থাকলে উত্তরার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করবেন বলে আশ্বাসও দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একজন প্রতিকামী সহদেবকে নিয়ে রাজসভায় উপস্থিত হলো। অভিবাদন জানিয়ে বললে—মহারাজ, এই লোকটা মহারাজের অশ্বশালার কাছে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছিল দেখে ধরে এনেছি।

প্রতিকামীর কথা শেষ হতেই সহদেব বললেন—মহারাজ, এই প্রতিকামীর সন্দেহ অমূলক। আমি একজন অশ্ববিশারদ। মহারাজের অশ্বশালার সামনে দিয়ে যাবার সময় কৌতূহলবশেই মহারাজের অশ্ববল দেখছিলাম। কৌতূহলী বিরাট প্রশ্ন করলেন—আমার অশ্ববল দেখে তোমার কি মনে হলো গ্রন্থিক?

সহদেব প্রত্যুত্তরে বললেন—মহারাজ, অধীনের অপরাধ যদি মার্জনা করেন তো বলি। মহারাজের অশ্বগুলি উপযুক্ত দেখাশোনার অভাবে দুর্বল ও হতশ্রী হয়ে পড়েছে বলেই মনে হলো।

বিরাট খুশি হয়ে বললেন—তুমি যদি সম্মত হও তোমাকেই আমি অশ্ব-শালার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করি।

পঞ্চপাণ্ডব তো একে একে রাজসভায় চলে গেলেন। মুস্কিল হলো পাঞ্চালীর। সরাসরি রাজসভায় যাওয়া সঙ্গত মনে হলো না। ভেবেচিন্তে একটা কালো উত্তরীয়ে গা ঢেকে পায়চারী করতে সুরু করলে রাজ-প্রাসাদের সামনে। কিছুক্ষণ পরে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণা প্রাসাদের উপর থেকে কালো উত্তরীয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি নারীকে ঐভাবে ঘুরতে দেখে পরিচারিকাকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন।

অন্তঃপুরে ঢুকে মহারাজ্ঞীর সামনে এসে দাঁড়ালো দ্রৌপদী। সুদেষ্ণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বললেন—ভদ্রে, তোমার আচ্ছাদন খোল। বলো কে তুমি ? আর কেনইবা প্রাসাদের সামনে ঐভাবে ঘোরাফেরা করছিলে ?

দ্রৌপদী বিনীতভাবে বললে—মহারাজ্ঞী, আমি সামান্য সৈরিন্ধ্রী। যিনি আমাকে আশ্রয় দেন আমি তাঁরই সেবা করি।

সুদেষ্ণা তার কথা বিশ্বাস করলেন না। তাঁর কণ্ঠে সংশয়ের সুর শোনা গেল।

—ভদ্রে, তোমাকে দেখে সামান্যা সৈরিন্ধ্রী বলে মনে হচ্ছে না। তোমার উন্নত নাসিকা, ব্রীড়াব্যঞ্জক মুখশ্রী, সুচিক্কণ কুঞ্চিত কেশরাশি সামান্যা নারীর মতো নয়। তোমার ক্ষীণ কটি সুগঠিত নিতম্বের তুলনায় ক্ষীণতর দেখাচ্ছে। তোমার সুপুষ্ট সুগোল স্তনদুটি পরস্পরের সঙ্গে যেন মিশে আছে। যে কোন রাজকন্যা তোমার উন্নত বক্ষ দেখে ঈর্ষা বোধ করবে। তুমি শ্যামাঙ্গী হয়েও সুচিক্কণ গাত্র কাশ্মীরি তুরঙ্গমার মতই সুঅঙ্গমা। সত্য বলো তুমি কে ? কোন দেবী না স্বর্গের অপ্সরা ?

রাজ্ঞীর মুখে নিজের দেহশ্রীর নিখুঁত বর্ণনা শুনে লজ্জা বোধ করলে

পাঞ্চালী। মাথা নীচু করে স্পষ্ট অথচ নিম্ন কণ্ঠে বললে—আমি দেবীও নই অপ্সরাও নই। পূর্বে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা আর পাণ্ডব-মহিষী পাঞ্চালীর দেহচর্যা করতাম। আমার নাম মালিনী। আপনার দেহচর্যার কাজ পেলে অনুগৃহীত বোধ করবো।

সুদেষ্ণা মৃদু হেসে বললেন—তোমার অভিপ্রায় তো বুঝলাম। কিন্তু তোমাকে দেখে আমিই যখন মুগ্ধ হচ্ছি তখন কোনও পুরুষের বিশেষ করে মহারাজের নজরে পড়লে আমাকেই হয়তো তোমার দেহচর্যার ভার নিতে হবে। তোমাকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা থাকলেও নিজের সর্বনাশ কি করে ডেকে আনি বলো?

পাঞ্চালী হাসতে হাসতে বললে—মহারাজ্ঞী, আপনার আশঙ্কার কারণ নেই। মহাবলশালী পাঁচজন গন্ধর্ব যুবা আমার স্বামী। তাঁরা অলক্ষ্যে থেকে সর্বদা পরপুরুষের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেন। আমার প্রতি কোনো কামুকের দৃষ্টি সহ্য করেন না। তবে আপনি যদি কথা দেন যে কারও চরণ বা উচ্ছিষ্ট আমাকে স্পর্শ করতে হবে না তাহলে আমি আপনার কাছে থাকতে পারি।

সুদেষ্ণা আশ্বস্ত হয়ে যাজ্ঞসেনীকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন।

* * *

দেখতে দেখতে দশ মাস নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। কিন্তু একদিন বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক কীচক ভগিনীর খোঁজে অন্তঃপুরে প্রবেশ-মুখে পাঞ্চালীকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দৃষ্টি দেখেই তাঁর মনোবাসনা টের পেয়ে পাঞ্চালী তাড়াতাড়ি কীচকের সামনে থেকে সরে গেল। কীচকও সোজা সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বললে—তোমাদের গৃহে আজ এক নতুন স্ত্রীলোককে দেখলাম। কোথা থেকে সংগ্রহ করলে এই রত্ন? এমন মন-মাতানো রূপ আমি আর দেখি নি।

সুদেষ্ণা ইচ্ছা করেই মালিনীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। তখন কীচক অস্থির হয়ে খুঁজতে খুঁজতে অন্তঃপুরের এক কোণে মালিনীকে দেখতে পেয়ে বললে—সুন্দরী, তুমি এখানে আত্মগোপন করে আছ কেন?

তোমায় দেখা অবধি আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। তোমাকে এখানে সুদেষ্ণার দেহচর্যায় নিযুক্ত দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। একাজ তোমার মতো সুন্দরীর শোভা পায় না। তুমি আজই আমার গৃহে চলো। স্ত্রীদের ত্যাগ করে আমি তোমার দাস হয়ে থাকবো।

কীচককে নিবৃত্ত করার জন্য মালিনী স্পষ্ট কণ্ঠে বললে—সূতপুত্র, আপনি ভুল করছেন। আমি বিবাহিতা। বীর গন্ধবরা আমার স্বামী। আমাকে কামনা করা আপনার উচিত নয়। অন্যায়ভাবে সে চেষ্টা করলে আপনি ঘোর বিপদে পড়বেন।

অত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র কীচক নয়। সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে সোজাসুজি বললে—দেখ, ঐ কামরূপিণীকে অন্তঃপুরে রেখে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না। একবার বিরাটের চোখে পড়লে তোমার দিকে আর ফিরেও তাকাবেন না। তাই ভাল কথা বলছি শোন, ঐ সৈরিন্ধ্রী যাতে আমার সেবা করে তার ব্যবস্থা করো। তাতে তোমারও মঙ্গল হবে আর আমিও তৃপ্তি পাব।

সৈরিন্ধ্রীকে একবার দেখামাত্র কীচকের অবস্থা দেখে সুদেষ্ণাও সেই কথাই ভাবছিলেন। ও যাই বলুক না কেন, রাজার দৃষ্টি পড়লে আর উপায় থাকবে না। তার চেয়ে ওকে কীচকের হাতে তুলে দেওয়াই ভাল।

কীচক তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছিল। সুদেষ্ণা বললেন—দেখ, কাজটা খুব সহজ হবে না। বলশালী গন্ধর্ব স্বামীরা ওকে সব সময়ে পাহারা দেয়। তবু চেষ্টা করে দেখতে পার।

অধৈর্য হয়ে কীচক বললেন—আরে, রাখ তোমার গন্ধর্বের কথা। অমন অনেক গন্ধর্বের কথা আমার জানা আছে। এখন বলো কি করলে ওকে ভোগ করতে পারবো।

সুদেষ্ণা বললেন—বলছি শোন। কোনো একটা পর্বের নাম করে তোমার গৃহে উত্তম সুরা ও নানা সুখাদ্য তৈরি করিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানিও। আমি অসুস্থতার জন্য নিজে না গিয়ে সৈরিন্ধ্রীকে তোমার গৃহে পাঠাবো সুরা আনতে।

কীচক বাধা দিয়ে সহর্ষে বলে উঠলো—থাক, থাক, বুঝেছি। আর বলতে হবে না।

কয়েকদিন পরেই কীচক এসে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। সুদেষ্ণা মালিনীকে ডেকে বললেন—সৈরিন্ধ্রী, আজ সেনাপতির গৃহে আমার জন্য উত্তম সুরা প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না বলে নিজে যেতে পারছি না। তুমি গিয়ে আমার জন্য সুরা নিয়ে এস।

সুদেষ্ণার কথা শেষ হতেই মালিনী আপত্তি জানিয়ে বললে—কয়েকদিন আগেই উনি আমার কাছে অসম্মানজনক প্রস্তাব করেছিলেন। ওঁর গৃহে একা যেতে আমি শঙ্কা বোধ করছি। আপনি বরং অন্য কোনো পরিচারিকাকে পাঠান সুরা আনতে।

সুদেষ্ণা বললেন—আমি নিজে যেখানে আমন্ত্রিত সেখানে সাধারণ পরিচারিকা পাঠানো শিষ্টাচার-সম্মত হবে না। তাছাড়া আমি যখন পাঠাচ্ছি তখন সেনাপতি তোমার কোনো অসম্মান করতে সাহস করবেন না। তাছাড়া বলশালী গন্ধর্বরা থাকতে তোমার ভয় কি!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুদেষ্ণার পীড়াপীড়িতে কীচকের গৃহে যেতে হলো স্বর্ণ-ভৃঙ্গার নিয়ে। তাকে আসতে দেখে কীচক আনন্দে যেন আটখানা। মালিনীর কাছে এসে গদগদ কণ্ঠে বললেন—মালিনী, আজ আমার গৃহ ধন্য হলো তোমার পদস্পর্শে। আমিও ধন্য হলাম তোমার চারু মুখখানি দেখে। তোমার আশায় কোমল শয্যা প্রস্তুত রেখেছি। চলো সুন্দরী আমরা সুরা পান করে মধুযামিনী যাপন করি।

দু'পা পেছিয়ে গেল মালিনী। কণ্ঠে শীতল নিস্পৃহতা স্পষ্ট হয়ে উঠলো—রাজমহিষী আমাকে সুরা আনতে পাঠিয়েছেন বলেই আপনার গৃহে এসেছি। সুরা পেলে আমি এখনই ফিরে যেতে চাই।

কীচক হেসে উঠলো। বললে—সুন্দরী ব্যস্ত হয়ো না। রাণীর সুরা নিয়ে যাবে পরিচারিকা। আর আমার সুরা, তুমি, আসবে আমার অঙ্কে। এই বলে কীচক মালিনীর হাত ধরে আকর্ষণ করতে গেল।

সবলে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হলো মালিনী। আবার

গিয়ে ধরতেই একটা প্রবল ধাক্কায় তাকে ধরাশায়ী করে এক ছুটে হাজির হলো সোজা রাজার সামনে। কিন্তু কিছু বলার আগেই উন্মত্ত কীচক ছুটে এসে পদাঘাত করলে তাকে। সেখানে রাজার বয়স্য যুধিষ্ঠির ছাড়া ভীমসেনও ছিলেন। চোখের সামনে পাঞ্চালীকে পদাঘাত করতে দেখে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে ভীম হাত দুটো মুঠো করে কীচককে বধ করতে উদ্যত হতেই যুধিষ্ঠির তাঁর পায়ের উপর চাপ দিয়ে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলেন। ভীমসেনেরও মনে পড়লো তাঁদের অজ্ঞাতবাসের কাল তখনো শেষ হয়নি। নিস্ফল আক্রোশে ভীম দাঁতে দাত চেপে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে মালিনী বলে উঠলো—মহারাজ, আপনার সামনে এই নরাধম যে জঘন্য আচরণ করলে তার বিচার করুন।

মহারাজ্ঞীর ভ্রাতা বলে যদি অপরাধীকে শাস্তি না দেন তাহলে বুঝবো আপনি নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে অসমর্থ।

বিচলিত হয়ে বিরাট বললে—সৈরিন্ধ্রী, যা এখন ঘটলো তা তো দেখলাম। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কিসের বিবাদ, কীচক কেনই বা তোমাকে পদাঘাত করলেন তা ভাল করে না জেনে কি করে বিচার করি?

রাজার ভয়ে সভাসদগণও নীরব দর্শকের মতো বসে রইলেন। নিপুণ অভিনেতার মত ছদ্ম ক্রোধ প্রকাশ করে যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন—সৈরিন্ধ্রী, তুমি এভাবে রাজসভায় এসে রাজার দ্যূতক্রীড়ায় বিঘ্ন ঘটালে। অন্তঃপুরে চলে যাও। গন্ধর্বরা যার পতি তার এভাবে ক্রন্দন শোভা পায় না।

ক্রোধে, অপমানে সৈরিন্ধ্রীর শরীর তখনও কাঁপছিল থেকে থেকে। সরোষে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে দ্যূতাসক্ত ব্রাহ্মণ, নারীদের লাঞ্ছনার প্রতিকারের চেয়ে আপনার কাছে পাশা খেলাই বড় বলে মনে হবে তা আমি জানি।

রাজসভায় কীচকের হাতে সৈরিন্ধ্রীর লাঞ্ছনা সংবাদ অন্তঃপুরেও পৌছে-ছিল। বিবশা পাঞ্চালীকে সামনে দেখে সুদেষ্ণা একটু অপ্রতিভ হলেন। বললেন—সৈরিন্ধ্রী, তুমি আমার আদেশে কীচকের গৃহে গমন করে-

ছিলে। তোমাকে লাঞ্ছিত করে গুরুতর অপরাধ করেছেন কীচক। যদি বলো তো আমি তাঁর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করতে পারি।
অতি বড় দুঃখেও হাসি পায় পাঞ্চালীর। সুদেষ্ণাই যে কীচককে এইভাবে সৈরিন্ধ্রীলাভের সুযোগ করে দিয়েছিলেন সেকথা বুঝতে বাকি ছিল না। কঠিন স্বরে বললে— মহারাজ্ঞী, আপনাকে পূর্বেই আমার অসম্মতির কথা নিবেদন করেছিলাম। তা সত্ত্বেও আমাকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন যাবার জন্য। ফলে যা ঘটবার ছিল তাই ঘটেছে। এখন আপনাকে আর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে না। যা করার আমার গন্ধর্ব পতিগণই তা করবেন বলে আমার বিশ্বাস। ক্রুদ্ধ গন্ধর্বগণের হাত থেকে কীচক সহজে রক্ষা পাবেন না।
কামুক কীচক যে অঙ্গ স্পর্শ করেছিল সে কথা মনে হতেই ঘৃণায় সর্বাঙ্গ যেন কুঞ্চিত হলো পাঞ্চালীর। মহারাণীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলে তাড়াতাড়ি। সর্বাঙ্গ মেলে দিলে শীতল জলধারায়। দেহের মালিন্য ধুয়ে যাওয়ার অবকাশে কীচক সম্বন্ধে আশু কর্তব্যও স্থির করে ফেললে মনে মনে।

২২

নিদ্রাসুখমগ্ন ভীমসেন জেগে উঠলেন একটা উষ্ণ আলিঙ্গনের প্রগাঢ়তায়। কানে এলো একটা চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।
—বৃকোদর, ওঠো, জাগো। তোমার প্রিয়তমা ভার্যার লাঞ্ছনাকারী এখনো বেঁচে আর ঘুমিয়ে থাকবে নিশ্চিন্ত আরামের শয্যায়।
ভীমসেন উঠে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়লো রাজসভায় সর্বসমক্ষে পাঞ্চালীর নিগ্রহের ঘটনা।
মৃদু স্বরে বললেন—পাঞ্চালী, কি ঘটেছিল সংক্ষেপে বলো তো আমাকে।

কেউ যদি না পারে আমি অবশ্যই যমালয়ে পাঠাবো ঐ কামুকটাকে।
ভীমসেনের শয্যায় বসে পড়ে পাঞ্চালী। কণ্ঠে ফোটে অসহিষ্ণু অনুযোগ।
—যুধিষ্ঠিরের মতো পাশাসক্ত পুরুষ যার স্বামী, তার ভাগ্যে আগে যা ঘটেছে আজও তাই ঘটলো। দ্যূতসভায় তোমাদের সকলের সামনে দুঃশাসন আমাকে দাসী বলে কেশাকর্ষণ করেছিল। কাম্যকবনে জয়দ্রথ আমার বাহুকর্ষণ করেছিল। আর আজ তোমাদের দুজনের সামনে কীচকের পদাঘাতও সহ্য করতে হলো তোমাদের ত্যাগ করে তাকে ভজনা করতে অসম্মতি প্রকাশ করার অপরাধে।
পরপুরুষের কাছে বারবার এইভাবে নিগৃহীত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। বৃকোদর, তোমরা মহানন্দে ধর্মপালন করো। আমি আর বাঁচতে চাই না।
উত্তেজনায় ভীমের বাহু দুটি কঠিন হয়ে ওঠে। বক্ষলগ্না পাঞ্চালী আবার বলে—একজন রাজার বয়স্যরূপে পাশার গুটিকা নিয়ে ব্যস্ত আর একজন নপুংসক সেজে রাজকন্যাকে নৃত্যগীত শেখাতে মগ্ন। অন্য দুজনের একজনকে দেখে মনে হয় তিনি যেন জন্মাবধি গোপ-গৃহেই লালিত। আর দ্বিতীয় জন সারাদিন অশ্বশালায় আত্মগোপন করে থাকাই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। একমাত্র তুমিই ব্যতিক্রম। তোমার মল্ল যুদ্ধই শুধু মনে করিয়ে দেয়, আমি পাণ্ডব-ভার্যা পাঞ্চালী। তুমি যখন যুদ্ধ করো আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি দেখে রাণী পরিহাস করে তাঁর পরিচারিকাদের বলেন, এই সৈরিন্ধ্রী পাচক বল্লভের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে তাব বিক্রম দেখে। হে বীর, তুমি তো জানো না কি জ্বালায় জ্বলছি আমি দিবারাত্র। আমার এই হাত দুটি স্পর্শ করে দেখো, রাজার জন্য নিত্য চন্দন পেষণ করে কি কঠিন হয়ে গেছে আমার করপল্লব। পাছে চন্দন রাজার পছন্দ না হয় তাই সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। আর সহ্য হয় না এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা। মনে হয় তিলে তিলে আমার মৃত্যুই সকলের কাম্য।
দুটি কোমল হাতের কাঠিন্য অনুভব করে ভীমের অন্তর করুণায় ভরে

গেল। আক্ষেপ ফুটলো তাঁর কণ্ঠে ঃ রাজসভাতেই আমি ঐ কামুকটার মস্তক চূর্ণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ধর্মরাজের পদাঙ্গুলির চাপে আমাকে নিবৃত্ত হতে হলো। আর ঐ অপদার্থ রাজা বিরাটও রেহাই পেলেন আমার হাতে নিগ্রহ থেকে। তুমি আর কটা দিন মাত্র ধৈর্য ধরো পাঞ্চালী। অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হলেই তোমার সব অপমানের প্রতিশোধ দেব। কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ালো পাঞ্চালী। আবেগভরা কণ্ঠে বললে—তোমরা সবাই শুধু অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞাই পালন করো মহা উৎসাহে। ধর্মপত্নী কামুকের লালসায় ভেসে গেলেও তোমাদের কিছুই ক্ষতি নেই। ভুলেও ভেবোনা যে, কীচক অত সহজে আমাকে অব্যাহতি দেবে। একমাত্র বিষ পান করলে হয়ত তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। আর কোনো পথ দেখি না। দ্যূতসভায় আমাকে অপমানিত হতে দেখে তুমিই শুধু চেয়েছিলে যুধিষ্ঠিরের পাশাসক্ত হাত দগ্ধ করতে। কামুক জয়দ্রথ তোমার হাতেই উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল। আজ চোখের সামনে কীচকের কাণ্ড দেখে তুমিও যদি সুযোগের অপেক্ষা করতে চাও তো তাই করো, বৃকোদর। তবে আমাকে আর দেখতে পাবে না। আমি বিষই পান করে সব জ্বালার পরিসমাপ্তি ঘটাবো অচিরে।

সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে ভীমসেন জ্বলে উঠলেন। শয্যা ছেড়ে অস্থির পদচারণা সুরু করে বললেন—পাঞ্চালী, আর বলো না। কাল প্রত্যুষে সকলের সামনেই যমালয়ে পাঠাবো ঐ কীচককে। বিরাটকেও সমুচিত শাস্তি দেব।

২৩

নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বুঝে পাঞ্চালী একটু আশ্বস্ত হলো। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে—না গো মশাই না। প্রকাশ্যে ঐ কীচককে বধ করা চলবে না। তাহলে অজ্ঞাতবাস আর গোপন থাকবে না। ফলে আবার বারো বৎসরের জন্য বনবাসে যেতে হবে। কীচককে গোপনে বধ করতে হবে।

ভীমসেন অসহায়ের মতো বললেন—গোপনে বধ করার সুযোগ কি করে পাব বলো ?

পাঞ্চালী খুশি হয়ে বললে—যা বলি মন দিয়ে শোন। কাল রাত্রে নির্জন নৃত্যশালায় আমি তার জন্য অপেক্ষা করবো শুনে কীচক নিঃসন্দেহে সেখানে যাবে। তারপর···

ভীম সোৎসাহে বললেন—আর বলতে হবে না। তারপর যা হবে তা পরেই দেখতে পাবে। তুমি আর দেরী করো না। নিজের গৃহে ফিরে যাও।

অনুমানই সত্য হলো। পরের দিন সকালে কীচক আবার এলো সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে। মালিনীকে ডেকে বললে—কাল নিশ্চয় টের পেয়েছ আমার কত ক্ষমতা! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা বিরাটেরও নেই। সে তো নামেই রাজা। আসল রাজা আমি। কাল ক্রোধের বশে তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করেছি বলে আমি দুঃখিত। নিতম্বিনী, তোমাকে আলিঙ্গন করার জন্য আমার প্রাণ অস্থির। কাল সারা রাত তোমার বাহু স্পর্শের স্মৃতিতে মশগুল ছিলাম। যার বাহুই এতো পেলব না জানি উত্তমাঙ্গ কত সুখদায়ক। সুন্দরী, স্থির জেনো তোমাকে না পেলে আর বাঁচবো না। তুমি আমাকে তৃপ্ত করো। যা তোমার কামনা সবই দেবো আমি।

মূর্তিমান লালসা দেখে ঘৃণায় শিউরে ওঠে পাঞ্চালী। কিন্তু কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে মনোভাব গোপন রেখেই একটু উৎসাহ দেখিয়ে বলে—সেনাপতি, আমি তোমার গৃহে যেতে চাই কিন্তু গন্ধর্ব স্বামীদেব ভয়েই যেতে পারছি না। যদি সত্যই আমাকে কামনা করো তাহলে আজ রাত্রে গোপনে নৃত্যশালায় এস। পালঙ্কেই আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। সৈরিন্ধ্রীর মুখে আশাতীত প্রস্তাব শুনে কীচকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলে আনন্দের আতিশয্যে। আরও কাছে গিয়ে বললে—সুন্দরী, তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা তো দূরের কথা, কাক-পক্ষীতেও জানতেপারবে না তোমার গোপনঅভিসারের কথা। আমি একলাই যাব নৃত্যশালায়। এখন যাবার আগে তোমার অধর-সুধা··· ।

কীচকের কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করলে মালিনী। নর-পশুটা যতক্ষণ না নিহত হচ্ছে ততক্ষণ শান্তি নেই বুঝে পাঞ্চালী এব ফাঁকে পাকশালায় গিয়েভীমসেনকে জানিয়ে দিলে কীচকের সম্মত হওয়ার সংবাদ। তারপর অশান্ত হৃদয়ে রাত্রির অপেক্ষায় রইলো সারাটা দিন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো সূর্যাস্তের পর। একটা কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে নৃত্যশালায় প্রবেশ করে এক নিভৃত কোণে আত্মগোপন করলে সৈরিন্ধ্রী। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি যেন দীর্ঘায়ত বলে মনে হতে লাগলো।

গাঢ় অন্ধকারে দেখা যায় না কিছুই। বেশ কিছুক্ষণ পরে পালঙ্কের মচ্-মচ্ শব্দ শুনে উৎকর্ণ পাঞ্চালীর বুঝতে বাকি রইলো না যে ভীমসেন নিঃশব্দে এসে শয্যা গ্রহণ করেছেন। স্মিত হাসি ফুটলো মুখে, কীচকের প্রত্যাশার কথা ভেবে। তারপর আবার শুরু হলো রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রহর গোনা।

ঠিক কতক্ষণ পরে জানে না, হঠাৎ উগ্র সুগন্ধে নৃত্যশালা ভরে গেল। তারপর একটি ভারী পদশব্দ খুশির ছন্দে। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হলো তৃতীয় কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করলে নৃত্যশালায়।

প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে ওঠে পাঞ্চালী। কোমল মুখখানিও যেন কঠিন হয়ে

উঠলো কামুকের নিশ্চিত পরিণতির কথা ভেবে।

কিছু গুঞ্জন উঠলো। তারপরেই শোনা গেল একটা চাপা ক্রুদ্ধ হাসি। রুদ্ধ নিশ্বাসে বসে রইলো পাঞ্চালী বহু প্রতীক্ষিত সংবাদের প্রত্যাশায়। ধস্তাধস্তির সঙ্গে একটা গুরুভার দেহের পতনের শব্দ হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই শুনতে পেল ভীমসেনের সুপরিচিত পদশব্দ।

অন্ধকারের মধ্যেই চাপা গলায় ডাকলে—বৃকোদর। —কে? পাঞ্চালী? তুমি কোথায়? ভীমসেনের ক্লান্ত স্বর শুনে সামনে এগিয়ে গিয়ে পাঞ্চালী উত্তর দিলে—হ্যা, প্রিয়তম, আমি। আশা করি শত্রু নিপাত গেছে।

—হ্যা। একেবারে যমালয়ে পাঠিয়েছি। দেখো গিয়ে কামুকটার কি অবস্থা করেছি। আমার কাজ শেষ। পাকশালায় ফিরে যাচ্ছি। সাবধানে থেকো।

পাঞ্চালী কৌতূহল দমন করতে না পেরে নৃত্যশালার কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। দেওয়াল-গিরির অনুজ্জ্বল আলোকেও দেখতে পায় কীচ-কের বিশাল দেহটার পরিবর্তে একটা রক্তাক্ত গোলাকার মাংসপিণ্ড। শিউরে উঠলো পাঞ্চালী। মনে হলো কীচক তাকে পদাঘাত করেছিল বলেই ভীমসেন তার হাত-পা দুইই উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট করে লালসার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন।

এখন তার কাজ হলো নৃত্যশালার বাইরে গিয়ে প্রহরীদের জানাতে হবে যে সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব পতিদের হাতে সেনাপতি নিহত হয়েছেন।

সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রহরীরা হতচকিত হয়ে মশাল নিয়ে নৃত্যশালায় ঢুকে পড়ে। সেনাপতির মৃতদেহ খুঁজতে গিয়ে একটা গোলাকার মাংস-পিণ্ড পড়ে থাকতে দেখে তারা রীতিমত ভয় পেয়ে আরও কয়েকজন প্রহরীকে ডেকে নিয়ে এলো।

সকলে মিলে মশালের আলো ফেলে সেনাপতির হাত-পা-মুণ্ডের খোঁজ শুরু করলে। সুযোগ বুঝে সৈরিন্ধ্রী পা বাড়াল অন্তঃপুরের দিকে।

২৪

অনেক খোঁজাখুজি করে ঐ মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে প্রহরীরা দৌড়ে গিয়ে খবর দিলে কীচকের অন্তরঙ্গদের। একশো-পঁচিশ জন উপ-কীচক ছুটে এলো। সেনাপতির পরিণতি দেখে কান্নাকাটি পড়ে গেল। প্রভাতে নৃত্যশালার পালংকে ঐ মাংসস্তূপ তুলে সকলে বেরিয়ে এলো সেনাপতির অন্ত্যেষ্টির উদ্দেশ্যে। শ্মশানযাত্রার আগে একজন উপ-কীচক বলে উঠলো—আর সেই সৈরিন্ধ্রী কোথায়? তার জন্যই তো সেনাপতি গন্ধর্বদের হাতে নিহত হয়েছেন।

আর একজন উপ-কীচক গলা আরও চড়িয়ে বললে—নিশ্চয় অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছে সেই শয়তানী। ধরে নিয়ে এস তোমরা। সেনাপতির সঙ্গে ঐ অসতীটাকেও আজ জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো।

বলামাত্র একদল হৈ-হৈ করে ছুটলা অন্তঃপুরে। মালিনীকে বেঁধে নিয়ে চললো শ্মশানে। ভীমসেন অলক্ষ্যে থেকে উপ-কীচকদের কাণ্ড দেখছিলেন। সৈরিন্ধ্রীকে নিয়ে ওরা চলে যেতেই অন্তঃপুরের পেছনের দরজা দিয়ে তিনিও বেরিয়ে পড়লেন। শ্মশানের কাছাকাছি পৌঁছেই দেখলেন চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে আর কীচকের সঙ্গে পুড়িয়ে মারার জন্য কয়েকজন টানাটানি শুরু করেছে সৈরিন্ধ্রীকে। বিকট গর্জন করে একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে তেড়ে গেলেন ভীমসেন। দানবাকৃতি ভীমসেনের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেই একজন উপ-কীচক ভয়ে চিৎকার করে উঠলো—ঐরে, গন্ধর্ব আসছে। ভাই সব পালাও শীঘ্র। মুহূর্তের মধ্যে শ্মশান ফাঁকা। জ্বলন্ত চিতার অদূরে বিবশা পাঞ্চালীর কাছে গিয়ে ভীমসেন বললেন—পাঞ্চালী, আর ভয় নেই। তুমি রাজভবনে চলে যাও পেছনের পথ দিয়ে। সামনের পথে ঐ পশুগুলো ছুটে গেছে। রাজভবনে পৌঁছবার আগেই আমি ওদেরও যমালয়ে পাঠিয়ে পাকশালায় ফিরে যাব।

অন্তঃপুরের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়ে অদূরে নির্জন সরোবর দেখে পাঞ্চালী খুশি হলো। অবগাহনে দেহ-মনের গ্লানি যেন ধুয়ে গেল। অন্তঃপুরে ঢুকে বুঝতে পারলে তার অবর্তমানে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। কীচকের মৃত্যুর পর শবযাত্রাকারী উপ-কীচকদেরও বধের সংবাদে উত্তেজিত আত্মীয়-স্বজন ছুটে গেছে রাজার কাছে। তাদের দাবী অবিলম্বে সৈরিন্ধ্রীকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করতে হবে। বিরাটও সব সংবাদ শুনে বিস্মিত বোধ করেছেন। অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীকে বলেছেন সৈরিন্ধ্রীকে ভালো কথায় বুঝিয়ে বিদায় দিতে। অন্তঃপুরের সর্বত্র কেমন যেন একটা আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। সৈরিন্ধ্রীকে দেখামাত্র যে যেখানে পারে গা ঢাকা দিতে ব্যস্ত। একটা কৌতুক অনুভব করে মালিনী ঘুরতে ঘুরতে পাকশালার সামনে এসে পড়লো। অতবড় পাকশালায় ভীমসেনকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসতে হাসতে বললে—এই যে গন্ধর্বরাজ! আপনার ভয়ে অন্তঃপুর থেকে পাকশালা পর্যন্ত প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে দেখছি! আমার রক্ষা কর্তা গন্ধর্বমশায়কে নমস্কার। ভীমসেনও হেসে উত্তর দিলেন—গন্ধর্ব-জায়ার কুশল হোক।

পাকশালা ছেড়ে পাঞ্চালী এগিয়ে গেল নৃত্যশালার দিকে। সেখানে ভয়ের কোনো চিহ্নও নেই। নৃত্য-শিক্ষার আসর জম-জমাট। অনেকগুলি বালিকার সঙ্গে বিরাট-কন্যা উত্তরা নৃত্যরতা। আর তাদের সামনে বসে আছে বৃহন্নলা। উত্তরা নৃত্য করতে করতে বৃহন্নলার সামনে গিয়ে যেন তার হৃদয়-ডালি নিবেদন করতে চাইছে। সবলা বালিকার আনত দেহ-বল্লরীর ভঙ্গিতে আর লাজ-রাঙা অনুরাগ-মাখা আত্মনিবেদনে পাঞ্চালীর দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু বৃহন্নলা-রূপী অর্জুনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়েও তার চোখে কামনার আভাসটুকুও দেখা গেল না। পদ্মাসনে বসে স্থির দৃষ্টিতে বৃহন্নলা যেন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতাই পর্যবেক্ষণ করছে। মুহূর্তের জন্য মনে পড়লো বনবাসী অর্জুনের কথা। উলুপী-চিত্রাঙ্গদা-সুভদ্রাকে দেখা মাত্র কামনার পীড়নে অস্থির হয়ে প্রতিশ্রুত ব্রহ্মচর্যে জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করেন নি যিনি, সেই অর্জুন দিনের পর

দিন অতি নিভৃতে কামনার অগ্নিশিখা স্বরূপিণী উত্তরাকে নিজের আয়ত্তে পেয়েও এত নিরুত্তাপ, নিষ্ক্রিয় কেন ? বনবাসী অর্জুনের নিত্য নতুন নারীর দেহ-সম্ভোগের কথা শুনে বঞ্চিত-হৃদয় একদা অর্জুনের ক্লীবত্ব কামনা করেছিল। তবে কি সত্যই নপুংসক হয়ে গেছেন তৃতীয় পাণ্ডব !

ভাব-ঘোরে কতক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়েছিল নিজেই জানে না। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে উত্তরা বলে উঠলো—আরে সৈরিন্ধ্রী যে ! ভাগ্যক্রমেই তুমি রক্ষা পেয়েছ কীচক আর উপকীচকদের কবল থেকে। ওরা এতই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল যে আমার পিতাকেও গ্রাহ্য করতো না।

অর্জুন উঠে এলেন আসন ছেড়ে। কৌতূহল প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠে। —সৈরিন্ধ্রী, ঐ কীচকদের কোন্ বীর বধ করে তোমাকে রক্ষা করলেন আমাকে বলবে ?

যেন ফুঁসে উঠলো মালিনী।

—বৃহন্নলা, সৈরিন্ধ্রী সম্বন্ধে তোমার এই অহেতুক কৌতূহল কেন ? রূপবতী রাজকন্যাদের নিয়ে তুমি তো দিব্যি দিন কাটাচ্ছ নৃত্যশালায়। হতভাগিনী সৈরিন্ধ্রীর বাঁচা-মরায় তোমার কি আসে-যায় !

উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাঞ্চালী অন্তঃপুরের দিকে চলে যায়। ব্যথাহত দৃষ্টিতে বিমূঢ় অর্জুন তাকিয়ে থাকেন।

মহারাজ্ঞী খোঁজ করছেন শুনে পাঞ্চালী দ্রুতপায়ে ঢুকলো সুদেষ্ণার কক্ষে। তাকে দেখামাত্র অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুদেষ্ণা বললেন—সৈরিন্ধ্রী, তোমার রূপলাবণ্য ইতিমধ্যেই এরাজ্যে অনেক বিপদ ঘটিয়েছে। তোমার গন্ধর্ব স্বামীদের ভয়ে সবাই অস্থির। কখন না জানি কোন্ অপরাধে কার প্রাণ যায়। আর তোমাকে অন্তঃপুরে রাখতে ভরসা পাই না। তুমি বরং আজই অন্য কোথাও আশ্রয় খুঁজে নাও।

পাঞ্চালী প্রমাদ গণলে। অজ্ঞাতবাস শেষ হতে আর মাত্র তের দিন বাকি। এ অবস্থায় স্থানত্যাগ পাণ্ডবদের পক্ষে খুবই বিপদজনক হতে পারে। মিনতিভরা কণ্ঠে বললে—মহারাজ্ঞী, আপনি অসময়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। আর এক পক্ষকালের মতো সময় দিন

আমাকে। তার মধ্যেই আমি আপনাদের রাজধানী ছেড়ে যাব। আর আমি কথা দিচ্ছি এই সময়ের মধ্যে আমার গন্ধর্ব স্বামীরা আপনাদের কোনও অনিষ্ট করবেন না।

২৫

অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসনকরোদ্ধৃতঃ।
স্মর্তব্যঃ সর্বকার্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা॥
যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ।
পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ॥
পঞ্চচৈব মহাবীর্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ॥
দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
যদ্যহন্তু ন পশ্যামি কা শান্তি হৃদয়স্য মে॥
ত্রয়োদশ হি বর্ষাণি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি মে।
নিধায় হৃদয়ে মন্যুং প্রদীপ্তমিবপাবকম্॥
বিদীর্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্য শল্য পীড়িতম্।
যোহয়মদ্য মহাবাহুর্ধর্মমেবানুপশ্যতি॥

মহারাজ বিরাটের অনুপস্থিতির সুযোগে মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করতে সম্মিলিত কৌরববাহিনী একজন মাত্র যোদ্ধার কাছে পরাভব স্বীকারের সঙ্গে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস থেকে আত্মপ্রকাশের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। সেই সংবাদ অচিরে হস্তিনাপুরেও পৌঁছাল। শোনামাত্র দুর্যোধন এই বলে হৈচৈ শুরু করলে যে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই অর্জুনের পরিচয় যখন জানা গেছে তখন শর্তভঙ্গের অপরাধে পাণ্ডবদের বার বৎসরের জন্য পুনরায় বনবাসী হতে হবে।

দুর্যোধনের অভিযোগ শুনে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের পরামর্শ চাইলেন। ভীষ্ম দৃঢ়-

কণ্ঠে বললেন—আমি গণনা করে দেখেছি যে, পাণ্ডবেরা নির্দিষ্ট সময়েই আত্মপ্রকাশ করেছেন। সুতরাং শর্তভঙ্গজনিত আবার বনবাসের প্রশ্ন অবান্তর। অনেক ক্লেশভোগ সত্ত্বেও তাঁরা বনবাসের শর্ত পালন করে প্রত্যাবর্তন করেছেন স্বরাজ্য প্রাপ্তির আশায়। ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য হবে তাঁদের সসম্মানে হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করা। দ্রোণ এবং বিদুরও ভীষ্মের যুক্তি সমর্থন করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের প্ররোচনা অগ্রাহ্য করে সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে পাঠালেন তাঁর শুভেচ্ছা ও শান্তির প্রস্তাব জানাতে।

কৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবরা সেই সময় পাঞ্চাল রাজ্য সন্নিহিত উপপ্লব্য নগরে অবস্থান করছিলেন। সঞ্জয় সেখানে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শুভেচ্ছা ও প্রস্তাব জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন পাণ্ডবরা হস্তিনাপুর যেতে ইচ্ছুক কি না।

সাত্যকি, দ্রুপদ, বিরাট এবং কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শের পর যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন—মহাত্মন, আপনি জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আমাদের প্রণাম জানিয়ে বলবেন যে, কুরুরাজ্যের একাংশ মাত্র প্রত্যাশা করি। যদি তাতেও দুর্যোধন সম্মত না হয় সেক্ষেত্রে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম পেলেও পাণ্ডবরা শান্তিতে বসবাস করবেন। সঞ্জয়ের দৌত্য ব্যর্থ হলে কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধেও আলোচনা শুরু হলো পাণ্ডব ভবনে। কৃষ্ণের উপস্থিতিতে পঞ্চপাণ্ডব একে একে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন আর নকুল কুলক্ষয় নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই কর্তব্য বলে কৃষ্ণকে অনুরোধ জানালেন শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হতে। একমাত্র সহদেবই ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তিনি স্পষ্ট বললেন—পাঞ্চালীর লাঞ্ছনার কথা বিস্মৃত হয়ে অগ্রজেরা যদি শান্তি স্থাপনে ব্যগ্র হন তো তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন। আমি একাই যুদ্ধ করবো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

পাণ্ডবদের মতামত শোনার পর যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ বললেন—মহারাজ কুরু-পাণ্ডব দু'পক্ষেরই হিতৈষী হিসাবে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আমি নিজেই

হস্তিনাপুর যাব। আমার চেষ্টা হবে আপনাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেই শান্তি স্থাপন করা। তবে দুরাত্মা দুর্যোধনের যা মতিগতি তাতে শান্তি সুদূর-পরাহত বলেই মনে হয়। তবু সাধ্যমতো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

পাণ্ডবদের আলোচনায় যোগ না দিয়ে পাঞ্চালী একপাশে চুপ করে বসেছিল। পাণ্ডবদের শান্তির জন্য আগ্রহ আর সহদেবের মুখে নিজের লাঞ্ছনার উল্লেখ শুনেও যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনকে নিরুত্তর দেখে অশ্রু সম্বরণ করতে পারলে না।

কৃষ্ণ তার দিকে তাকিয়ে বললেন—কৃষ্ণা, তুমি কিছুই বললে না তো! অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে পাঞ্চালী বললে—বাসুদেব, আমার মতো মন্দভাগিনীর আবার মতামত কি! স্বয়ংবর সভার পর থেকেই যার ভাগ্যে শুধু লাঞ্ছনাই জুটেছে তার মতো অভাগিনীর মতামতে তোমাদের কি আসে যায়। দ্যূত-সভায় চরম অপমানের পরেও এতদিন এই আশায় জীবন ধারণ করেছি যে, উপযুক্ত সময় হলে আমার পঞ্চপতি দুর্যোধন-দুঃশাসনকে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত করে নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন। আজ সেই সামান্য আশাটুকুও নির্মূল হলো শান্তিপ্রেমীদের কথায়! ধিক্কার জানাই অর্জুনের গাণ্ডীব আর ভীমসেনের বাহুবলকে।

সখা, এতদিন তুমিই ছিলে আমার আশা ভরসা সব কিছু। কিন্তু আজ তোমার কথা শুনেও মনে হচ্ছে আশা শুধু কুহকিনী। নাহলে তুমিও ভুলে যাও কাম্যকবনে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা!

সহদেব ঠিকই বলেছেন তোমাদের কারুরই মতিস্থিরতা নেই। আমি কিছুই বলতে চাই না। তুমি যখন হস্তিনাপুরে যাবে বলেই স্থির করেছ তখন নিবৃত্ত করার প্রশ্নও ওঠে না। যাচ্ছ যাও। যাবার আগে দুঃশাসনের হস্ত-কলংকিত আমার এই বেণীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। এই বেণী আজও খোলা রয়েছে পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞা পালনের অপেক্ষায়।

যুধিষ্ঠির বাধা দিয়ে বললেন—পাঞ্চালী, তুমি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছো। আমরা যুদ্ধ করবো না একথা বলি নি। তবে শান্তির জন্য চেষ্টা করাও তো ধর্ম সঙ্গত কাজ।

যুধিষ্ঠিরের কথা শেষ হতেই পাঞ্চালী দৃপ্তকণ্ঠে বললে—ধর্মের দোহাই দিয়ে আপনারা সকলেই যদি যুদ্ধবিমুখ হতে চান তো তাই থাকুন। কিন্তু ভুলে যাবেন না, আমি পঞ্চপুত্রের জননী। আমার পুত্রেরা কেউ কাপুরুষ নয়। মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠবে তারা। তাদের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হবে দুঃশাসনের কলংকিত বাহু আর দুর্যোধনের গর্বোদ্ধত মস্তক।

কৃষ্ণ উঠে গেলেন পাঞ্চালীর কাছে। ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—সখি, আমাকে ভুল বুঝো না। শান্তির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর যাওয়ার মূলে আমার গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। গুহ্য ব্যাপার নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা করা উচিত নয় বলেই খুলে বলি নি। কিন্তু এখন আর না বলে উপায় নেই। শোন সখি, যে যাই মনে করুন, আমি জানি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্য-ম্ভাবী। আর সে যুদ্ধ শুধু কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভারতের অন্যান্য রাজারাও সেই যুদ্ধে লিপ্ত হবেন কোনোও না কোনো পক্ষে যোগ দিয়ে। হস্তিনাপুরে শান্তির প্রস্তাব করার সময় আমার প্রধান কাজ হবে কৌরবদের প্রকৃত জনবল পর্যবেক্ষণ করা আর পাণ্ডব-পক্ষে বলবৃদ্ধির চেষ্টা। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হলেও শত্রুপক্ষের প্রকৃত শক্তি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন। তাই বলছি, সখি, অশ্রু সম্বরণ করো। শান্ত হও। তোমার চোখে অশ্রুর অন্তরালে আমি কি দেখছি জানো, সখি?

অশ্রুভরা চোখেই কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললে পাঞ্চালী—কি দেখছো সখা?

দেখছি পৃথিবী-জোড়া ধ্বংসের ছায়া। সেই মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হবে। পাণ্ডবদের জয় হবে ঠিকই কিন্তু সে জয়···

বিস্মিত কৃষ্ণার জিজ্ঞাসা বুঝেও কথা শেষ না করেই কৃষ্ণ উঠে গেলেন সেখান থেকে।

হস্তিনাপুরে কৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হলো। দুর্যোধনের বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের পাঁচখানা গ্রাম পর্যন্ত না দেবার মতলব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো পাণ্ডব-হিতৈষী কৃষ্ণকে বন্দী করার অপচেষ্টায়। কৃষ্ণও অবশ্য সব রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়েই কৌরব রাজসভায় গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গী সাত্যকিও সতর্ক ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে কৃতবর্মার সঙ্গে বাছা বাছা বৃষ্ণিযোদ্ধা নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো সভাকক্ষে। কৃষ্ণকে রক্ষার জন্য তাঁর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কৃষ্ণ সন্মোহিনী শক্তিতে দুর্যোধনকে নিষ্ক্রিয় করে সবান্ধবে রাজসভা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বিনা বাধায়। বিদুরের গৃহে কুন্তীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে কর্ণের সন্ধান করলেন। কর্ণ নিজের রথে রাজধানীর দিকেই আসছিলেন। কৃষ্ণের সাদর আহ্বানে নিজের রথ থেকে নেমে কৃষ্ণের রথে উঠলেন। সারথি দারুককে রথ চালানোর আদেশ দিয়ে কৃষ্ণ কর্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন - মহামতী, আমার আহ্বানে তুমি হয়তো বিস্মিত হয়েছ। এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই আমি তোমার সাহায্যের প্রত্যাশী হয়েছি। সেই উদ্দেশ্য হলো কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের নিবারণ। আমি জানি তুমি পাণ্ডবদের শত্রু দুর্যোধনের হিতসাধনে বদ্ধসঙ্কল্প। তোমার এই পাণ্ডব বিরোধিতা সকলে অসঙ্গত মনে করলেও আমি করি না। আমি জানি, পাণ্ডবদের অসঙ্গত উক্তি ও আচরণেই তুমি তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করো। দুর্যোধন যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে তোমার চিত্ত জয় করেছে। কাজেই তার প্রতি তোমার পক্ষপাত খুবই সঙ্গত। আমার ধারণা পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির ফলেই তোমার ও পাণ্ডবের সম্বন্ধ এতটা তিক্ত হয়ে উঠেছে। আমি বিশ্বাস করি, তোমার মতো অজেয় বীরের আনুকূল্য পেয়েই দুর্যোধন এক সর্বাত্মক কুলধ্বংসী যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলতে সাহসী হয়েছে।

কর্ণ, তুমি শুধু অজেয় বীর নও, ধর্মবেত্তা, ধর্মপরায়ণ, দানশীল ও উদার-হৃদয়। তুমি কি একথা অস্বীকার করো যে, দুর্যোধন পাণ্ডবদের পিতৃরাজ্য থেকে বঞ্চিত করে, তাদের জীবন নাশের যড়যন্ত্র করে ঘোরতর অন্যায় করেছে ? যুধিষ্ঠির অন্যায় পাশা খেলার আহ্বান গ্রহণ করে রাজা ধৃত-রাষ্ট্রের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। শকুনির কপট পাশা আর অন্যায় পণের কৌশলে পাণ্ডবেরা বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের অশেষ দুঃখ ভোগ করেছেন। এত শত্রুতা সত্ত্বেও তারা কিন্তু কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে শুধু ন্যায্য রাজ্যভাগ, অন্যথায় পাঁচটি গ্রাম মাত্র চেয়ে-ছেন শান্তিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পাপী দুর্যোধন তাতেও রাজী হয় নি। সে যুদ্ধ চায়। বাধ্য হয়েই পাণ্ডবেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে-ছেন। হে বীরচূড়ামণি, এ সবই তোমার জানা আছে। তবু কেন তুমি কৌরবপক্ষ ত্যাগ করছো না ? তুমি কি ভুলে গেছ যে, যতই প্রবল হোক না কেন শেষ পর্যন্ত অধর্মেরই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ?

কর্ণ ধৈর্য ধরে কৃষ্ণের কথা শুনছিলেন। জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণকে বললেন —বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, তুমি যা বললে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু যে দুর্যোধন আমার মর্যাদা রক্ষায় সদা সচেষ্ট, আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে পরম আগ্রহী আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমার সাহায্যপ্রার্থী, কোন্ নীতি-শাস্ত্রবলে আমি তার পক্ষ ত্যাগ করবো তা বুঝতে পারছি না। যে পাণ্ডবেরা পরম অবজ্ঞায় সূতপুত্র বলে আমাকে নিয়ত ধিক্কার জানায় কোন্ যুক্তিতে তাদের পক্ষাবলম্বন করতে অনুরোধ করছো তুমি ?

—সেই কথা বলার জন্যই তো আজ তোমাকে আহ্বান করেছি বন্ধু। আমি জানি, তুমি সূত অধিরথের পুত্র নও। তুমি পাণ্ডবদের অগ্রজ। ভদ্রা কুন্তীর প্রথম সন্তান। ভাগ্যবিড়ম্বনায় অধিরথ কর্তৃক পালিত হলেও ধর্মানুসারে তুমিই কুরুরাজ্যের সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। পাণ্ডবেরা তোমার প্রকৃত পরিচয় জানেন না বলেই তোমাকে সূতপুত্র বলে বিবে-চনা করেন। তুমিও তো নিজেকে রাধেয় বলেই পরিচয় দাও। যে মুহূর্তে তাঁরা তোমার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারবেন, আমার স্থির বিশ্বাস যে,

তোমার কাছে নতজানু হয়ে পূর্বের সব অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবেন। সাগ্রহে তোমার সিংহাসন লাভের পথ প্রশস্ত করবেন। সেজন্য যদি প্রয়োজন হয়, কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধই করবেন। শুধু সহোদর ভায়েরাই নন, তোমার মাতৃকুলের অন্ধক ও বৃষ্ণিবীরগণও তোমার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বশ্যতাজ্ঞাপন করবেন।

আমি মনে করি, পাণ্ডবদের কাছে তোমার যথার্থ পরিচয় দেওয়ার সময় হয়েছে। তাই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই উপপ্লব্যে পাণ্ডবদের কাছে। যাবে বন্ধু আমার সঙ্গে ?

একটা ম্লান হাসি ফুটলো কর্ণের মুখে। মৃদু কণ্ঠে বললেন—কৃষ্ণ, তুমি যে গোপন কথা বললে আমারও তা অজানা নয়। কিন্তু দৈববশেই আজ আমি অধিরথ-রাধার পুত্র বলে পরিচিত। যে জননী নিজের অসহায় শিশু-পুত্রকে লোকলজ্জার ভয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারেন, তাঁকে মা বলে না ডেকে যে নারী সেই শিশুকে রক্ষা করেছেন, লালন-পালন করেছেন নিজের সন্তানের মতো সূতবংশীয়া সেই রাধাকেই জননী বলে স্বীকার করা আমি কর্তব্য বলে মনে করি। তাই পাণ্ডুপুত্র হয়েও রাধেয় বলেই আমি পরিচিত থাকতে চাই। তুমি আমাকে রাজত্ব, সহায়-সম্পদের প্রলোভন দেখিও না কৃষ্ণ। বলো না ধর্মাধর্মের কথা। পাণ্ডবদের কাছে সূতপুত্র রূপে বারবার অপমানিত নিন্দিত কর্ণকে সূতপুত্ররূপেই তার আশ্রয়দাতা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতে দাও নিজের পৌরুষমাত্র সম্বল করে।

কর্ণের মর্মবেদনা অনুভব করে কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন কৃষ্ণ। তারপর গভীর সহানুভূতির স্বরে বললে—কর্ণ, হয়তো ভাগ্যদোষেই তোমাকে এত বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। আমি এও বুঝি যে, যাকে তুমি কামনা করেছ, সর্বাংশে যোগ্য প্রার্থী হয়েও তার রূঢ় প্রত্যাখ্যানই তোমাকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে তার প্রতি।

কৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝে সচকিত কণ্ঠে কর্ণ বলে উঠলেন—বাসুদেব, কি বলতে চাও তুমি ?

কর্ণের গলা জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে বললেন কৃষ্ণ।

– রাধেয়, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারো নি। সেদিন যাজ্ঞসেনীর নির্মম সগর্ব প্রত্যাখ্যানের কথা শোনামাত্র তুমি ধনু ত্যাগ করে চলে যাবার আগে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিলে যাজ্ঞসেনীর দিকে। তখন তোমার ব্যথা-ভরা অনুরাগী দৃষ্টি দেখে গভীর বেদনা বোধ করেছিলাম। কেন জানো, বন্ধু ? সমব্যথী বলেই তোমার দৃষ্টির ভাষা আমার কাছে অবোধ্য থাকে নি। তোমার মতো আমি সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম তার ব্যক্তিত্বভরা রূপলাবণ্যে। কিন্তু আজ একথা না বলে পারছি না যে, সেদিন তুমি ভুল বুঝেছ যাজ্ঞসেনীকে। সে সূতপুত্র বলেই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে নি। সেদিন জন-অরণ্যের মধ্যে দুচোখ মেলে সে কেবলই খুঁজেছিল যাকে সে অর্জুন ছাড়া আর কেউ নয়। যাকে সে মনেপ্রাণে চাইছে, যখন খুঁজছে অসহায়ের মতো কিন্তু পাচ্ছে না, ঠিক সেই সময়ে তুমি এগিয়ে গেলে অর্জুনের উদ্দেশ্যে রাখা তার বরমাল্যখানি বাহুবলে জিনে নিতে। তোমার জ্যা আরোপনের অনায়াস ভঙ্গি দেখে আশঙ্কায় বুক তার বুঝি কেঁপে উঠেছিল। তাই আর কোনো উপায় না দেখে তোমাকে ফিরিয়ে দেবার সহজ পথই বেছে নিয়েছিল সে। কৃষ্ণের কথায় বিস্মিত হলেন কর্ণ। বললেন—তুমি পাঞ্চালী সম্বন্ধে যে কথা বললে তা আমার জানা ছিল না। স্বয়ংবরে যেখানে লক্ষ্যভেদের শর্ত থাকে সেখানে কন্যা কি করে স্বয়ংবরা হতে পারে তাও আমি জানি না। পাঞ্চালীকে অর্জুনের প্রতি অনুরক্তা জানলে আমি অবশ্যই লক্ষ্যভেদে উদ্যোগী হতাম না। তাছাড়া অপমানিত হয়েও তার কোনো অসম্মান আমি করি নি। কিন্তু যেদিন শুনলাম সেই অর্জুন-লব্ধা পঞ্চপতিকে ভজনা করছে সেদিন থেকে তাকে আর সাধ্বী বলে মনে করতে পারি নি। সেই ধারণাবশেই আমি কৌরব সভায় কিছু পরুষ বাক্য বলেছি।

কৃষ্ণ মাথা নেড়ে বললেন —তুমি আবার ভুল করলে। যাজ্ঞসেনী স্বেচ্ছায় পঞ্চপাণ্ডবকে পতি বলে গ্রহণ করে নি। অর্জুন-জননী কুন্তীদেবীর নির্দেশেই পঞ্চপাণ্ডবই তার পাণিগ্রহণ করেছেন। আর কুন্তীদেবীর মনোবাসনা

বুঝেই যাজ্ঞসেনী নিজের মনকে পক্ষপাতশূন্য করেছে। আজ যদি সে জানতে পারে, তুমি যুধিষ্ঠিরেরও অগ্রজ, তবে স্বতঃই সে তোমাকেও পতিত্বে বরণ করে তোমার সঙ্গেই সর্বাগ্রে মিলিত হবে।

কর্ণ, তুমি অভিমান ত্যাগ করো। আমার অনুরোধে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে নিজের জন্মসূত্রের বন্ধন স্বীকার করো। আমরা সবাই মিলে তোমাকেই ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করবো। সব অসম্মানমুক্ত হয়ে তুমি কুরু-বংশকে গৌরবমণ্ডিত করো। এই সর্বনাশা যুদ্ধের সম্ভাবনা নির্মূল হোক তোমার শুভেচ্ছা আর সহযোগিতায়।

প্রত্যুত্তরে কর্ণ বললেন—না, বাসুদেব, তা হয় না। জন্মসূত্রের যে সম্বন্ধ ভাগ্যদোষে নষ্ট হয়েছে তা ফিরে পাবার আশায় বা রাজ্যের লোভে, আমি আমার সর্বজনজ্ঞাত সম্বন্ধ মিথ্যা বলে মনে করতে পারি না। সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ে নয়, পাঞ্চালীর দেহ-সান্নিধ্যের লোভে তো নয়ই। আমার ধর্মপত্নীদের আমি প্রতারিত করতে পারি না। পারি না পালক-পিতামাতা অধিরথ-রাধার স্নেহ-ভালবাসার অসম্মান করতে। দুর্যোধন আমার ভরসাতেই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করেছে। তাকেও আমি এখন ত্যাগ করতে পারি না।

কৃষ্ণ হতাশার স্বরে বললেন—কর্ণ, আমি তোমাকে সব কথাই বললাম। কিন্তু তুমি শুনলে না। আমার স্থির বিশ্বাস কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদেরই জয় হবে কারণ তাঁদের যুদ্ধ হবে ধর্মযুদ্ধ। পক্ষান্তরে কৌরবরা যুদ্ধ করবে লোভ আর ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে।

মুখে হাসি বজায় রেখেই বললেন কর্ণ:

—মাধব, তুমি যা বললে তা হয়ত সত্য। তোমার মতো অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞ ও সমরবিশারদ যে পক্ষের পরামর্শদাতা সে পক্ষেরই যে শেষ পর্যন্ত জয় হবে তাও আমি অনুমান করি। কিন্তু পরাজয়ের আশঙ্কায় কৌরবপক্ষ ত্যাগ করা আমার পক্ষে উচিত কাজ হবে না। তোমাকে একটা শুধু অনুরোধ করবো যে, আমার মৃত্যুর আগে পাণ্ডবেরা যেন আমার প্রকৃত পরিচয় জানতে না পারে। এই বলে কৃষ্ণকে গাঢ়

আলিঙ্গন করে নেমে পড়লেন কর্ণ কৃষ্ণের রথ থেকে। তারপর নিজের রথে উঠে বিপরীত দিকে অশ্বচালনা করলেন। যতক্ষণ দেখা যায় কৃষ্ণ তাকিয়ে রইলেন কর্ণের রথের দিকে। তারপর সারথিকে উপপ্লব্য নগরের দিকে রথ চালনার নির্দেশ দিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হলেন।

২৭

উপপ্লব্যে পৌঁছেই কৃষ্ণ, কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটুকু ছাড়া, হস্তিনা-পুরের সব কথা পাণ্ডবদের বললেন। যুধিষ্ঠির দুঃখিত হলেন। কেউ কিছু বলার আগেই ভীম বলে উঠলেন—মিথ্যা সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই। কৃষ্ণের কথায় যে দুর্যোধন কর্ণপাত করবে না তা আমি আগেই জানতাম।

কৃষ্ণের পরামর্শে যুদ্ধ সজ্জার মন্ত্রণা শুরু হলো। সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য-বাহিনীর পরিচালন ভার গ্রহণ করলেন দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, চেকিতান, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন আর শিখণ্ডী। যুদ্ধ পরিচালনার সামগ্রিক ভার দেওয়া হলো ধৃষ্টদ্যুম্নকে। স্থির হলো শুভদিনে কৃষ্ণকে পুরোভাগে নিয়ে সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যু ও যাজ্ঞসেনীর পঞ্চপুত্র সহ পাণ্ডবগণ কুরু-ক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। অন্যান্য স্ত্রীলোক আর দাসদাসী নিয়ে যাজ্ঞসেনী উপযুক্ত প্রহরাধীনে উপপ্লব্য নগরেই অবস্থান করবে।

আসন্ন যুদ্ধের খবর পেয়ে বলরামের নেতৃত্বে শাম্ব, প্রদ্যুম্ন অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধক যোদ্ধারা উপপ্লব্যে উপস্থিত হলেন। বলরাম যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন যে, কুরু ও পাণ্ডব দুপক্ষই তাঁদের মিত্র সুতরাং এ যুদ্ধে কোনো পক্ষেই যোগদান তাঁর কাম্য ছিল না। কিন্তু তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও কৃষ্ণ যখন

পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন তখন কৃষ্ণকে ছেড়ে তিনি কুরুপক্ষে যোগ দিতে পারেন না। কৃষ্ণ যে পক্ষে সে পক্ষেরই জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু ভীমসেনের মতো দুর্যোধনও তাঁর প্রিয় শিষ্য। তাই দুর্যোধনের পরাজয় ও কুলনাশ তিনি স্বচক্ষে দেখতে চান না। তাই একা চলে যাচ্ছেন তীর্থভ্রমণে। যাবার আগে পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করার উদ্দেশ্যেই তাঁর উপপ্লব্যে আগমন। বৃষ্ণি ও অন্ধকদের মতো ভোজ ও দাক্ষিণাত্যের অধিপতি রুক্মীও সসৈন্যে যোগ দিলেন পাণ্ডবপক্ষে।

এদিকে কৌরবপক্ষের যুদ্ধসজ্জাও সম্পূর্ণ। ভীষ্মের নেতৃত্বে কর্ণ, কৃতবর্মা, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, শল্য, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, নীল, ভগদত্ত প্রমুখ রথীবৃন্দ দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে উপযুক্ত দিনক্ষণের প্রতীক্ষায় রইলেন। কৃষ্ণের সংশপ্তক বাহিনীও কৌরব বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে অধীর আগ্রহে যুদ্ধের দিন গুণতে শুরু করলো।

২৮

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপলক্ষে উপপ্লব্যে সমবেত পিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সহ বহু আত্মীয়স্বজনের বহুকাল পরে দেখা পেয়ে পাঞ্চালী আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল। দীর্ঘ তের বৎসর পরে পুত্রদের কাছে পেয়ে সব দুঃখকষ্টের কথাও যেন ভুলতে পেরেছিল। তাদের সাহচর্যে মহানন্দে দিন কাটছিল প্রথম দিকে। কিন্তু যুদ্ধের দিন যতই এগিয়ে এলো পুত্রদের দেখা পাওয়াও ততই যেন ভার হয়ে উঠলো। সারাদিন তারা রণসজ্জায় ব্যস্ত থাকতো। দিনান্তে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে শুধু আহারটুকু শেষ হওয়ার অপেক্ষা। তারপর মায়ের সঙ্গে কথা শুরু হতে না হতেই অঘোরে নিদ্রা। ঘুমন্ত সন্তানদের পরিশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর মমতায় মায়ের চোখ ভরে যেত জলে।

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এলো যুদ্ধযাত্রার দিন। পাঁচপুত্র দাদা অভিমন্যুকে নিয়ে প্রণাম করতে এলো যাজ্ঞসেনীকে। তাদের সকলের মস্তক আঘ্রাণ করে যাজ্ঞসেনী বললে—এই তোমাদের প্রথম যুদ্ধে যোগদান। বীর পাণ্ডবসন্তান তোমরা। বীরের মতো যুদ্ধ করে পিতৃপিতামহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখ। আশীর্বাদ করি তোমরা জয়যুক্ত হও।

পঞ্চপাণ্ডবও একে একে এসে বিদায় চাইলেন যাজ্ঞসেনীর কাছে। বিশাল পাণ্ডববাহিনী তূর্য-ভেরী নিনাদের সঙ্গে এগিয়ে চললো কুরুক্ষেত্রের অভিমুখে। যাজ্ঞসেনীর চোখের সামনে উপপ্লব্য নগর যেন হঠাৎ জনশূন্য হয়ে গেল। অজানা আশঙ্কায় চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠলো। কে জানে এই মহাযুদ্ধের কি হবে পরিণতি!

যাত্রার আগে প্রিয়তমা মহিষীর বিশেষ অনুরোধে যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উপপ্লব্যে নিয়মিত সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষে উপপ্লব্যে এসে পৌঁছাল দারুণ দুঃসংবাদ। বিরাট-নন্দন উত্তর আর শল্য নিহত। অজ্ঞাতবাসের দীর্ঘ একবৎসর যাজ্ঞসেনী বিরাট-ভবনে কাটিয়েছে। উত্তরের মৃত্যুসংবাদে চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণার মুখখানি। বিষাদে ভরে গেল মন। সেই শুরু। তারপর একটা করে দিন যায় আর কৌরব-পাণ্ডব—দু'পক্ষেরই বীর যোদ্ধাদের মৃত্যুবরণের সংবাদ আসে।

২৯

ভীষ্ম ন'দিন ধরে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে পাণ্ডব শিবিরে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন অসংখ্য যোদ্ধাকে নিহত করে। দশম দিনের যুদ্ধশেষে খবর এলো, অর্জুনের শরে ভীষ্মের পতন ঘটেছে। আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ও বোধ করলো যাজ্ঞসেনী। দূতকে প্রশ্ন করলো—কিভাবে পতন হলো পিতামহের বলতে পার? দূত সবিনয়ে জানালে যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কুরু-সেনাপতি নিজের বধের উপায় বলে দেন। তিনি বলেন, দ্রুপদ-পুত্র মহারথ শিখণ্ডী জন্মকালে স্ত্রীলোক ছিলেন। পরে পুরুষে রূপান্তরিত হন। কুরু সেনাপতি স্ত্রীলোক, স্ত্রী-নামধারী পুরুষ, শরণাপন্ন ও বিকলেন্দ্রিয় এক পুত্রের পিতা ও নীচ জাতীয় লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। শিখণ্ডী পুরুষ হলেও স্ত্রী-নামধারী। সুতরাং তাঁকে সামনে রেখে যুদ্ধ করলে অর্জুনের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। পিতামহের পরামর্শ অনুসারেই অর্জুন তাঁকে শরবিদ্ধ করে ভূপাতিত করেছেন।

কনিষ্ঠ সহোদরা শিখণ্ডীর দেহের পরিবর্তনের গোপন কথা যাজ্ঞসেনী শুনেছিল কাম্যক বনে। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সে সময়। তখন সে ঘটনা প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালিপনা বলেই মনে হয়েছিল। এখন ভীষ্মের পতনের মূলে যে শিখণ্ডীর উপস্থিতি সে কথা শুনে মনে হলো তার রূপান্তর অকারণে নয়, দৈববশেই ঘটেছিল। তা না হলে এত সহজে পাণ্ডবেরা ভীষ্মের হাত থেকে রক্ষা পেতেন কিনা সন্দেহ!

দ্বাদশ দিনের যুদ্ধ বিবরণ কেবলই দুঃসংবাদে ভরা। যাজ্ঞসেনীর খুল্লতাত সত্যজিত নিহত। ক্ষতবিক্ষত যুধিষ্ঠিরের জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ। ভগদত্তের অস্ত্রে নিশ্চিৎ মৃত্যুর হাত থেকে অর্জুনকে বাঁচাতে গিয়ে কৃষ্ণ আহত। পরের দিন সূর্যাস্তের অনেক পরেও দূতের দেখা না পেয়ে যাজ্ঞ-

সেনী মুহ্যমানের মতো বসেছিল নিজের শয্যাপ্রান্তে। হঠাৎ সুভদ্রার হাহাকার শুনে ছুটে গেল তার কক্ষে। বীর পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে স্বয়ং কৃষ্ণ এসেছেন সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিতে। কৃষ্ণের মুখে নিজের সন্তানতুল্য অভিমন্যুর ছয় রথীর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণের মর্মান্তিক কাহিনী শেষ হওয়ার আগেই জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো যাজ্ঞসেনী। অনেকক্ষণ জল সিঞ্চনের পর সংবিত ফিরতে কানে এলো কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর। সুভদ্রাকে বলছেন—সুভদ্রা, বীর অভিমন্যু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করে স্বর্গলাভ করেছে। তুমি বীর জননী। পুত্রের মৃত্যুতে শোক করো না।

যাজ্ঞসেনীকে একটু সুস্থ হতে দেখে কৃষ্ণ বললেন—সখি, উতলা হয়ো না। ধৈর্য ধরো। বধূ উত্তরার কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়াই এখন তোমার সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য।

অবসন্ন শরীরটাকে কোনো রকমে টেনে নিয়ে যেতে হলো উত্তরার কাছে। উন্মাদিনীর মতো হাহাকার করে উঠলো নব-বিবাহিতা উত্তরা। গভীর সহানুভূতিতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে যাজ্ঞসেনী। অশ্রুসাগরে ভাসতে লাগলো দুজনেই। অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করে আরো শোকাতুরা হলো যাজ্ঞসেনী। নিজের পুত্রদের কথাও মনে পড়লো। ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

চতুর্দশ দিন শেষ হলো। সারা রাত মাটিতেই পড়ে রইলো সে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূত এলো কিনা সে সংবাদ নেওয়ার কোনো ইচ্ছাই হলো না।

পঞ্চদশ দিনের প্রভাতে দূত এসে জানিয়ে গেল আগের দিন সারা রাত ধরে ভীষণ যুদ্ধের খবর—কর্ণ নাকি সুযোগ পেয়েও প্রাণনাশ না করে ভীমকে ছেড়ে দিলেও তাঁর পুত্র ঘটোৎকচকে বধ করেছেন।

ষোড়শ দিন গেল। দূত জানালো ভীষণ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে সপৌত্র মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাটরাজ আর কৌরবপক্ষে সেনাপতি দ্রোণাচার্যের মৃত্যুসংবাদ। পিতার মৃত্যুসংবাদে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে বহু প্রত্যাশিত দ্রোণ-বধের ঘটনাও ম্লান হয়ে গেল।

সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবদের বিরাট সাফল্যের কথা সবিস্তারে বলতে শুরু করেন দূত। কি করে অর্জুন বধ করলেন কুরু সেনাপতি কর্ণকে, কি করে ভীমসেন দুঃশাসনকে মাটিতে ফেলে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে তাঁর বুক চিরে রক্তপান করে উন্মাদের মতো নাচতে নাচতে বলে উঠেন— পৃথিবীর সব পানীয় তুচ্ছ। স্বর্গের অমৃতও এই উষ্ণ রক্তের মতো সুস্বাদু নয়! ভীমকে ঐভাবে রক্তপান করতে দেখে রাক্ষস মনে করে সৈন্যসামন্ত রণক্ষেত্র থেকে নাকি পালিয়ে গিয়েছিল! হাতের ইশারায় দূতকে স্থান-ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়ে নিজের কক্ষে ফিরে যায় যাজ্ঞসেনী। বুক ফেটে যেন একটা আর্তস্বর বেরিয়ে আসে—হা ভগবান! আর কতদিন ধরে চলবে এই নরমেধ যজ্ঞ!

পরের দিন আবার আসে দূত যুদ্ধের সংবাদ দিতে। ভাবলেশহীন মুখে বসে থাকে যাজ্ঞসেনী। ভীমসেনের গদার আঘাতে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের সংবাদেও মন উল্লসিত হয় না। অবিরাম কুলক্ষয় আর স্বজন-বিয়োগের ব্যথায় শত্রু সংহারের সংবাদও ম্লান হয়ে যায়। মন ভরে যায় অপরিসীম বেদনায়। আর কোনো জয়ের কথা নয়, শত্রু সংহারের কথাও নয়—মন শুধু চায় যুদ্ধবিরতি আর অক্ষতদেহে স্বজনের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ।

অষ্টাদশ দিনও অতিক্রান্ত হয়। যুদ্ধ থেমেও যেন থামে না। দূত এসে জানায়, কুরু পক্ষের তিনজন মাত্র তখনো জীবিত। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা। সেই তিন মহাবীর দ্বৈপায়ন হ্রদ-কূলে অন্তিম শয্যায় শায়িত দুর্যোধনের সামনে নতুন করে শপথ নিয়েছেন পঞ্চাল-পাণ্ডবদের ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হবেন না। দুর্যোধনও নাকি খুশি হয়ে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি মনোনীত করেছেন।

যাজ্ঞসেনী সচকিত হয়ে ওঠে। অসংখ্য পাণ্ডববীরের মধ্যে তখনো জীবিত শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কজন। সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁর পুত্রেরা, শিখণ্ডী আর পঞ্চপুত্র সহ পাণ্ডবেরা। তবে কি এঁদের কেউই নিস্তার পাবেন না মহা-কালের ধ্বংসলীলা থেকে!

পরের দিনই দ্বিপ্রহরে পাণ্ডবদের একটি রথ ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো উপপ্লব্য নগরে। রথ থেকেনেমে নকুল যাজ্ঞসেনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর নিরানন্দ কণ্ঠে বললেন—পাঞ্চালী, আমাদের জয় হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।
নকুলের বিষাদ-ভরা মুখে জয়োল্লাসের কোনোও চিহ্ন নেই। যাজ্ঞসেনী ভাবলো তারই মতো পঞ্চপাণ্ডবের মনও প্রিয়জন হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত। নীরবে রথে উঠে বসলো নকুলের পাশে।
যুধিষ্ঠির নতমুখে বসেছিলেন। যাজ্ঞসেনীকে আসতে দেখে ভীমকে ইঙ্গিত করলেন তাকে পরিত্যক্ত শিবিরের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে। সেখানে তখনো শায়িত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী আর যাজ্ঞসেনীর পুত্রদের রক্তাক্ত দেহ। সেই দৃশ্য দেখে যাজ্ঞসেনী সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ভীমসেন জলধারা দিয়ে জ্ঞান সঞ্চার করলেন। তারপর হাত ধরে যাজ্ঞসেনীকে নিয়ে গেলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।
যুধিষ্ঠিরকে দেখা মাত্র যাজ্ঞসেনী কান্নায় ভেঙে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতেই বললো—মহারাজ, আপনারা থাকতে আমার নিদ্রিত সন্তানেরা কি করে নিহত হলো?
যুধিষ্ঠির অশ্রুসজল চোখ মাটির দিকে নামিয়ে বললেন—পাঞ্চালি, কাল যুদ্ধশেষে শিবিরে না ঢুকে আমরা নদীতীরেই রাত্রি কাটিয়েছিলাম। সেই সুযোগে নীচ অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে তস্করের মতো আমাদের শিবিরে প্রবেশ করে আমাদের পাঁচভাই মনে করে নিদ্রিত বালকদের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডীকেও নৃশংসভাবে হত্যা করে গেছে!
শোকের ছায়া মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাজ্ঞসেনীর মুখ ক্রোধে আরক্তিম হয়ে উঠলো। ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—আত্মরক্ষার জন্য নদীতীরে আশ্রয় নেওয়ার সময় নিজেদের বালক পুত্রদের কথা যাঁদের মনে পড়ে না তাঁরা যথার্থই বীরপুরুষ! মহারাজ পুত্রদের সাক্ষাৎ যমের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষাত্রধর্ম পালন করেছেন আপনারা। আপনি ভাগ্যবলে সারা ভারতের

সম্রাট হয়েছেন। এখন আর মনে থাকবে কেন দুঃখিনী সুভদ্রা, উত্তরা আর পাঞ্চালীর কথা! মনে থাকবে কেন আমাদের বীর পুত্রদের কথা —যারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে আপনার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে গেল।

মাথা না তুলে শান্ত কণ্ঠে বললেন যুধিষ্ঠির :

—কল্যাণি, তোমার ভ্রাতা ও পুত্রেরা ক্ষাত্রধর্ম অনুসারেই নিহত হয়েছেন। তাঁদের জন্য শোক করো না। পাপী অশ্বত্থামা আমাদের ভয়ে দুর্গম বনে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুঁজে বের করাও দুষ্কর।

যুধিষ্ঠিরের কথায় কর্ণপাত না করে পাঞ্চালী বলে ওঠে :

—মহারাজ, আমার ভাগ্যে যা ছিল, তাই ঘটেছে। তবে জেনে রাখুন, আজই যদি সেই ভণ্ড তপস্বী অশ্বত্থামাকে পাণ্ডবেরা বধ না করেন তাহলে এখানেই অনশনে প্রাণ ত্যাগ করবো আমি।

যুধিষ্ঠিরকে তবু নিরুত্তর দেখে ভীমসেনের দিকে তাকিয়ে সকাতরে বলে পাঞ্চালী—বৃকোদর, তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। জ্বলন্ত জতুগৃহ থেকে তুমিই আমাদের বহন করে বাইরে এনেছিলে। পাণ্ডবভার্যাকে স্পর্শ করার অপরাধে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলে জয়দ্রথ আর কীচককে। এখন দ্রোণের সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দাও তুমি পুত্রহারা জননীর মুখ চেয়ে।

ভূলুণ্ঠিতা ভার্যাকে আশ্বাস দিয়ে ভীম ধনুর্বাণ নিয়ে রথে উঠলেন নকুলকে সারথি করে।

কৃষ্ণ গিয়েছিলেন অর্জুনকে নিয়ে হস্তিনাপুরে। পুত্রহারা গান্ধারী আর ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে। ফিরে এসে সব কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ, ভীমসেনকে একা পাঠিয়ে আপনি উচিত কাজ করেন নি। আপনিও সঙ্গে গেলেন না কেন? দ্রোণাচার্য অর্জুনের মতো নিজের পুত্রকেও প্রলয়কারী ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রয়োগ শিখিয়েছিলেন। সেই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলে ভীমসেন আত্মরক্ষা করতে পারবেন না।

তারপর যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ ভীমসেনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। অদূরেই ভীমসেনের রথ দেখতে পেয়ে তাঁকে নিয়ে সদলে অশ্বত্থামার খোঁজ শুরু করলেন। গঙ্গাতীরে ব্যাসদেবের পাশে লুকিয়ে ছিলেন অশ্বত্থামা। ভীমসেনকে দেখেই শরক্ষেপে উদ্যত হলেন। কিন্তু পেছনে অর্জুন ও কৃষ্ণ রয়েছেন টের পেয়ে শরত্যাগ করে মাটি থেকে একটা কাশ তুলে নিয়ে তাঁদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করে বললেন—পাণ্ডবেরা ধ্বংস হোক। সঙ্গে সঙ্গে সেই কাশখণ্ড কালান্তক অগ্নিতে পরিণত হয়ে যেন সবেগে গ্রাস করতে এলো পাণ্ডবদের। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনও ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করে প্রতিহত করলেন অশ্বত্থামার অস্ত্র।

দুটি দিব্যাস্ত্রে যেন প্রলয়াগ্নি সৃষ্টি হলো। ব্যাসদেব ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামা আর অর্জুনকে বললেন—তোমাদের আগে কেউ কখনো এই অস্ত্র মানুষের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেন নি। তোমরা কেন একাজ করলে? শীঘ্র প্রত্যাহার করো নিজেদের অস্ত্র।

অর্জুন বললেন—তপোধন, আমি আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলাম। আপনার কথায় প্রত্যাহার করছি।

অশ্বত্থামা লজ্জিত হয়ে বললেন—ভগবন, ঐ অস্ত্র প্রত্যাহারের ক্ষমতা আমার নেই। পাণ্ডবদের বাঁচাতে হলে ঐ অস্ত্র পাণ্ডবনারীর গর্ভে

নিক্ষেপ করা ছাড়া উপায় দেখি না।

ব্যাসদেব বললেন—তবে তাই হোক। তবে তোমার মাথার মণি পাণ্ডবদের দিয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করো তুমি।

উপায়ান্তর নেই দেখে মাথার মণি ভীমসেনের হাতে তুলে দিয়ে অশ্বত্থামা বনের দিকে ছুটে গেলেন।

ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ বলে উঠলেন—কাপুরুষ, কোথায় পালাবে? পাঁচটি নিদ্রিত বালককে বধ করেও তোমার জিঘাংসা মেটে নি তাই কুরুবংশ নির্মূল করার অভিপ্রায়ে অভিমন্যু-ভার্যা উত্তরার গর্ভ নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছ। নরাধম, তোমার পাপকর্মের কি পরিণতি তা জেনে যাও। আমার কিছুমাত্র পুণ্য যদি থেকে থাকে তবে সেই পুণ্যবলেই উত্তরার মৃত শিশু আবার প্রাণ ফিরে পাবে আর তুমি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে জনহীন অরণ্যপ্রদেশে।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে ভীমসেন ফিরলেন অশ্বত্থামার মাথার মণি নিয়ে। যাজ্ঞসেনীকে ভীম বললেন—পাঞ্চালি, তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছে। এই নাও অশ্বত্থামার মাথার মণি। অশ্বত্থামার যশ, মান, অস্ত্র সবই গেছে। শুধু প্রাণটুকু সম্বল করে কৃষ্ণের নিদারুণ অভিশাপ মাথায় নিয়ে অনন্ত নরক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তার।

উঠে দাঁড়ালো পাঞ্চালী। বললো—বোধহয় উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে তার। আমার মণির কোনো প্রয়োজন নেই। মহারাজ যুধিষ্ঠির বরং মস্তকে ধারণ করুন।

৩১

কৃষ্ণের মুখে কুরুবংশের শেষ পরিণতির কথা শুনে পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী, কুন্তী আর শত শত বিধবা পুত্রবধূকে নিয়ে হস্তিনাপুব ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছিলেন। তাঁদের আসার সংবাদ শুনে পঞ্চপাণ্ডবও কৃষ্ণ, যাজ্ঞসেনী ও অন্য পঞ্চাল-বধূদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন দেখা করতে। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে ভীমের খোঁজ করলেন সাগ্রহে। বৃদ্ধ রাজার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে কৃষ্ণ ভীমের পরিবর্তে দুর্যোধনের গড়া ভীমের লৌহমূর্তি এগিয়ে দিয়ে বললেন—এই যে ভীমসেন। দুই বাহুর কঠিন নিষ্পেশনে লৌহমূর্তি ফেটে গেল। ধৃতরাষ্ট্র কপট দুঃখে বলে উঠলেন—আহা, ভীমসেন, তুমি আমার আলিঙ্গনটুকুও সহ্য করতে পারলে না।

কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন—মহারাজ, কপট শোক প্রকাশের প্রয়োজন নেই। আপনি ভীমের লৌহমূর্তিই চূর্ণ করেছেন। তাই আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। আগে বহুবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি অন্ধ পুত্রস্নেহে নিজের পুত্রদের ধ্বংসের কারণ হয়েছেন। এখন পাণ্ডবদের বধ করলেও আপনার পুত্রেরা ফিরে আসবে না। তাই বলছি, প্রতিহিংসা বর্জন করে পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র লজ্জা পেয়ে বললেন—মাধব, তুমি যথার্থ কথাই বলেছ। পুত্র-শোকে উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করেছি আমি। তোমার কথায় আমার ক্রোধ দূর হলো। আমি আবার পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করতে চাই নিজের পুত্রের মতো।

ধৃতরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করে পাণ্ডবেরা গান্ধারীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। যুধিষ্ঠির প্রণাম করে বললেন—দেবি, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব হিসেবে আমিই আপনার পুত্রনাশের কারণ। আপনি আমাকে অভিশাপ দিন।

গান্ধারী নিরুত্তর। বস্ত্রাবৃত চক্ষুর তীর্যক দৃষ্টিপাতে প্রণত যুধিষ্ঠিরের হাত দুটি যেন মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেল।

ভীমসেনও এসে প্রণাম করলেন। গান্ধারী বললেন—বৃকোদর, তুমি মহাপাপ করেছ। শুধু অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে বধই করো নি, সেই সঙ্গে রাক্ষসোচিত কাজ করেছ দুঃশাসনের রক্তপান করে।

দুর্যোধনের উরুভঙ্গের জন্য বলরাম তীব্র ভৎর্সনা করে ভীমসেনকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। এখন গান্ধারীর মুখে সেই অভিযোগ শুনে কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন ভীমসেন। মাথা নিচু করে মৃদু কণ্ঠে বললেন—দেবি, দুঃশাসনকে দ্যূত-সভায় পাঞ্চালীর কেশ আকর্ষণ করতে দেখে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ক্ষত্রিয় হিসাবে শুধু সেই প্রতিজ্ঞাই রক্ষা করেছি যুদ্ধক্ষেত্রে। দুঃশাসনের রক্ত আমার ভ্রাতৃরক্ত তুল্য। সে রক্ত আমার ওষ্ঠের নিচে নামে নি। আর দুর্যোধন অধর্ম করেছিল আমাদের গৃহহীন করে। পাঞ্চালীকে প্রকাশ্য রাজ-সভায় নিজের অনাবৃত উরু দেখিয়ে সে নিজেই নিয়তি বশে ভগ্ন-উরু হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। কপট দুর্যোধনের অপরাধেই আজ কুরুকুল বিনষ্ট। আমাদের দোষ কি বলুন ?

গান্ধারী সরোদনে বললেন—আমি জানি কাদের দুষ্কর্মের ফলে কুরু বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। তোমরা নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতার কথা ভেবে তাদের একটি পুত্রকেও তোমরা রেহাই দিলে না কেন ? আমার ধার্মিক পুত্র বিকর্ণ কি শত্রুতা করেছিল তোমাদের ?

বিকর্ণের মৃত্যুর কথা শুনে যাজ্ঞসেনীও মর্মাহত হলো। মনে পড়লো প্রকাশ্য দ্যূতসভায় মহামতি ভীষ্ম পর্যন্ত ধর্মাধর্মের প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। কেউই যখন যাজ্ঞসেনীর কথার সদুত্তর দিলেন না তখন ঐ বালক বিকর্ণই সমর্থন করেছিল তাকে। সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছিল পাঞ্চালীকে দুর্যোধন জয় করতে পারেন নি ধর্ম অনুসারে। সেই উদার, ধর্মভীরু বালকের জন্য যাজ্ঞসেনীর হৃদয় দুঃখে ভরে গেল।

পাণ্ডবদের নিরুত্তর দেখে গান্ধারী ক্রুদ্ধ হলেন। কঠিন স্বরে বললেন—

কোথায় গেলেন সেই পাণ্ডব-হিতৈষী কৃষ্ণ ? তিনিই আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

কৃষ্ণ এগিয়ে এসে বললেন—দেবি, আপনার উক্তি সর্বাংশে সত্য। একমাত্র বিকর্ণই ছিল আপনার সুযোগ্য সন্তান। ধার্মিক, স্পষ্টবাদী, নির্ভীক বিকর্ণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে বলে আমরা সকলেই দুঃখ অনুভব করি। কিন্তু বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে যখন হানাহানি শুরু হয়ে যায় তখন শত্রু-পক্ষের মধ্যে ভালো-মন্দের বিচার করার অবকাশ থাকে না। বিকর্ণ বীরের মতো যুদ্ধ করে স্বর্গলাভ করেছেন।

গান্ধারী আবার বললেন—কেশব, তুমি যাই বলো, আমি মনে করি তুমিই এই যুদ্ধের প্রকৃত নায়ক। বুদ্ধি, সাহস, শক্তি, সহায় কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তোমার। ইচ্ছা থাকলে আর কেউ না পারলেও তুমি পারতে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে। কিন্তু তুমি তা করো নি। তার কারণ, তুমি বৃষ্ণি ও অন্ধক-বিরোধী ক্ষত্রিয়কুলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আমার পুত্রেরা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে। কিন্তু আমাকে মনস্তাপ দেওয়ার ফল তোমাকেও ভোগ করতে হবে। আজীবন ধর্মপথে থেকে পতি-সেবার যদি কোনো পুণ্যবল থাকে তবে সেই পুণ্যবলেই তোমাকে অভিশম্পাত দিচ্ছি কৌরবদের মতো অন্ধক আর বৃষ্ণি বংশও তোমার হাতেই ধ্বংস হবে। নিজের কুলধ্বংস স্বচক্ষে দেখার পর তোমার মৃত্যু হবে বন্য প্রাণীর মতো কোনোও অরণ্যাচারীর হাতে।

কৃষ্ণের মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটলো। অস্ফুটস্বরে বললেন—সাধ্বী আপনার অভিশম্পাত মাথা পেতে নিলাম। আমিও বুঝতে পারছি, অন্যা-য়ের প্রতিরোধ অন্যায় দিয়ে করা যায় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমারই পরা-মর্শে পাণ্ডবেরা কৌশলে শত্রুনিধন করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যায় যুদ্ধে ধর্মের প্রত্যবায়ও ঘটেছে। সেই প্রত্যবায়ের দায় আমাদের সকলকেই মাথা পেতে নিতে হবে। শুধু অন্ধক, বৃষ্ণিরা কেন, আমরা কেউই ধর্মের বিধান লঙ্ঘন করতে পারবো না।

কৃষ্ণের স্বীকারোক্তি শুনে গান্ধারী শান্ত হলেন। ভীত, উদ্বিগ্ন, শোক-

গ্রস্ত পাণ্ডবদের সান্ত্বনা দিয়ে মৃত স্বজনদের যথোপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা করতে বললেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কুরুবধূদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাতীরে বীর-তর্পণ করলেন পাণ্ডবেরা।

মৃতদেহ সৎকারের আগে কর্ণের ভুক্তাবশেষ মৃতদেহ দেখে শোকাতুরা কুন্তী আর স্থির থাকতে পারলেন না। সরোদনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন বৎস, মহাবীর কর্ণ আমার গর্ভজাত সন্তান। তোমার জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের সম্মানে তোমরা সকলে তর্পণ করো।

মায়ের কাছে কর্ণের প্রকৃত পরিচয় শুনে যুধিষ্ঠির অসহায় শিশুর মতো উচ্চ-স্বরে বিলাপ করতে করতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন —জননী, এতদিন কেন বলেন নি একথা? হায় ভগবান! সূতপুত্র বলে যাজ্ঞসেনী যাঁকে সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করেছেন স্বয়ংবর সভায়, আমরা ক্ষত্রিয়ের অধিকার থেকে যাঁকে বঞ্চিত করেছি, প্রতিনিয়ত ব্যঙ্গে জর্জরিত করেছি নীচে বংশোদ্ভব বলে, যাঁকে বধ করার উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে তাঁর সহজাত কবচ-কুণ্ডল হরণ করেছি প্রতারণার সাহায্যে, সেই মহামতি কর্ণ আমাদেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর! কর্তব্যবোধে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও যিনি স্নেহবশে ভীমকে সুযোগ পেয়েও বধ করেন নি তাঁকেই অর্জুন বধ করেছেন অন্যায় যুদ্ধে। হায় জননী! কেন সেই মহাবীরের জন্মরহস্য গোপন রেখে আপনি এই ভ্রাতৃহত্যা ঘটালেন। কর্ণের পরিচয় যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম তাহলে আমি নিজে গিয়ে নতজানু হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে এই কুল-ধ্বংসী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতাম। হায়, একি শুনলাম!

যুধিষ্ঠিরের মর্মভেদী কান্না শুনে কুন্তী জ্ঞান হারালেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই পরম লজ্জা আর দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে কর্ণ-পত্নীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর তাঁদের সকলকে নিয়ে গঙ্গাতীরে গেলেন তর্পণ করতে।

কর্ণের পরিচয় শুনে অপরিসীম লজ্জা আর অনুশোচনায় যাজ্ঞসেনীর হৃদয় মুচড়ে উঠলো। স্বয়ংবরের দিন এই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সূতপুত্র বলে সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করেছিল! আর কর্ণ? নিজের প্রকৃত পরিচয় জেনেও বিনা

প্রতিবাদে উদ্যত ধনু ত্যাগ করেছিলেন। নিজের যোগ্যতা, কুলগৌরব থাকা সত্ত্বেও কামনার বশে অধীর হয়ে পালক পিতার স্নেহের অমর্যাদা করেন নি! এত বড় মন, এত মহৎ হৃদয় অথচ কত ব্যথা, কত অভিমান সঞ্চিত ছিল সে হৃদয়ে!

নিজের কথাও মনে হয়। অর্জুনকে ভাল বেসেছিল বলেই সে স্বেচ্ছায় নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল পঞ্চপাণ্ডবকে পতি বলে গ্রহণ করে। কিন্তু কর্ণ! জানতে ইচ্ছা করে কোন্ প্রেরণায় তিনি এমন করে হাসিমুখে নিজের সর্বনাশ বরণ করে নিলেন! পাণ্ডব-জননী কুন্তীর নিষ্ঠুরতার প্রতি অক্ষমায় না নিজের ভাগ্যের প্রতি নিদারুণ ঔদাসীন্যে? তবে কেন তিনি সেদিন স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যবস্তু ভেদে উদ্যত হয়েছিলেন? তবে কি কর্ণও তাকে কামনা করেছিলেন? ভালবেসেছিলেন এই অভাগিনী যাজ্ঞসেনীকে?

অশ্রুধারায় বুক ভেসে যায়।

মন বলে—হে মহৎ অভিমানী, আজ সব আত্মাভিমান চূর্ণ হয়েছে যাজ্ঞসেনীর। অমৃতলোকযাত্রী হে বীর, তুমি এই ভেবে তাকে ক্ষমা করো যে তোমার মতো সেও নিজেকে বলি দিয়েছে। তোমারই মতো তিলে তিলে অনুভব করেছে ব্যর্থ জীবন-যন্ত্রণা। তুমি ভাগ্যবান, তাই জীবন বিসর্জন দিয়ে মুক্তি পেয়েছ। অভাগিনী যাজ্ঞসেনী আজও পুড়ছে চিত্ত-দাহে।

একটা মর্মবিদারী বেদনা যেন অভিভূত করে মনকে। কাকে ভালবেসেছিল সে? সে কি অর্জুন না একটা কল্পরূপকে—যার সঙ্গে মানুষী মূর্তির কোনো মিল খুঁজে পায় নি সে! মন বলে, যাজ্ঞসেনী তুমি পুরুষের চিত্তবিভ্রমকারী রূপের অধিকারিণী নারী মাত্র নও। তুমি অনন্যা। তোমার জৈব সত্তার সঙ্গে মিশে আছে পৌরুষের দীপ্তি। তোমার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে মাতৃত্বের বাঁধনে সীমিত রাখতে চেয়েই ব্যর্থ হয়েছেন পঞ্চপাণ্ডব। তোমার ঐ ইচ্ছাময়ী রূপের পরিচয় পেয়েই কর্ণ নীরবে সরে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে। তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বও তোমাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে নি, করেছে নির্লিপ্ত। এই নির্লিপ্তিই তোমাকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছে।

তুমি নিঃসঙ্গ।

পাঞ্চালীর মনে হয়, তার অন্বেষা আজও শেষ হয় নি। আজও সে খুঁজছে সেই পরম পুরুষকে—যার পৌরুষের সঙ্গে তার ইচ্ছাশক্তির মিলন ঘটবে। মন বলে, তোমোকে নিয়ত যিনি কর্ষণ করেছেন তিনিই কৃষ্ণ। ইন্দ্রিয়জগৎ অতিক্রম করে মনের গহনে তাঁর আনাগোনা বলেই তিনি গভীর; অনন্ত ভাবলোকের আস্পদ—চিন্ময়। সেই চিন্ময়ের ধ্যানেই পাষাণী দেহে প্রাণধারার স্পন্দন জাগে। তাই সেই পরম ভালবাসার, সেই প্রাণ-সখার জন্য তোমার অনন্ত প্রতীক্ষা।

৩২

স ত্বং ভ্রাতৃনিমান্ দৃষ্ট্বা প্রতিনন্দস্ব ভারত।
ঋষভাম্বি সন্মতান্ গজেন্দ্রানূর্জিতানিব॥
অমর প্রতিমাঃ সর্বে শক্রসাহাঃ পরন্তপাঃ।
একোঽপি হি সুখাৈয়ষাং মম স্যাদিতি মে মতিঃ॥
কিংপুনঃ পুরুষব্যাঘ্র পতয়ো মে নরর্ষভাঃ।
সমস্তানীন্দ্রিয়াণীব শরীরস্য বিচেষ্টনে॥
যেষানুন্মত্তকো জ্যেষ্ঠঃ সর্বে তেঽপ্যনুসারিণঃ।
তবোন্মাদন্ মহারাজ সোন্মদাঃ সর্বপাণ্ডবাঃ॥
যদি হি স্যুরনুন্মত্তা ভ্রাতরস্তে নরাধিপ।
বধ্বাত্বাং নাস্তিকৈ সার্ধং প্রশাসেয়ুর্বসুন্ধরাম্॥

মৃতের সৎকার-তর্পণাদি কৃত্য শেষ করে যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরলেন শূন্যহৃদয়ে। দারুণ অনুশোচনায় অস্থির হয়ে অর্জুনকে বললেন—ধনঞ্জয়, এই স্বজনশূন্য রাজধানীতে আমার আর বাস করার ইচ্ছা নেই। রাজ্যশাসন তুমিই কর। আমি কৃতকর্মের জন্য তপস্যা করতে বনগমন করবো।

জ্যেষ্ঠের মুখে সেই অবিশ্বাস্য কথা শুনে অর্জুন হাসলেন। বললেন—মহা রাজ, আপনি অমানুষিক কর্মের ফলে যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হয়েছেন এখন তা ত্যাগ করতে চান। ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রী রাজ্যভোগ করতে পারে না। আপনি রাজপুত্র। সমগ্র বসুন্ধরার আপনি অধীশ্বর হয়ে এখন মূঢ়তার বশে ধর্ম, অর্থ ত্যাগ করে বনবাসী হতে চাচ্ছেন।

মহারাজ, আপনি অবশ্যই জানেন যে, অর্থই ধর্ম, কাম ও স্বর্গের কারণ। অর্থ বিনা মানুষের প্রাণ রক্ষাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভেবে দেখুন, দেবগণও তাঁদের জ্ঞাতি অসুরগণকে বধ করেই সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিলেন। রাজার ধর্মকাজ পরের ধনের সাহায্যেই অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ, এখন সর্বদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞই আপনার অনুষ্ঠেয়। একাজে বিরত হলে আপনার পাপ হবে।

যুধিষ্ঠিরকে তবু নিরুত্তর দেখে ভীম বললেন—মহারাজ, আপনি হীনবুদ্ধি বেদপাঠক ব্রাহ্মণের মতো কথা বলছেন কেন? আমার আশঙ্কা আপনার রাজকার্যে অনীহার প্রকৃত কারণ আলস্যপ্রিয়তা। আপনার এরকম মতিচ্ছন্ন ঘটবে জানলে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হতাম না। নিজেরা বলশালী, মনস্বী হয়েও আপনার ন্যায় ক্লীবের বশবর্তী—এর জন্য দোষী আমরাই। বনে গমন করে কপট ধর্মাচরণে রত হলে আপনার মৃত্যুই হবে।

ভীমের শ্লেষবাক্যে যুধিষ্ঠির বিরক্তি প্রকাশ করলেন—বৃকোদর, তুমি উদর-নীতি ছাড়া আর কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারো না। সুতরাং রাজধর্ম সম্বন্ধে বৃথা বাক্যব্যয় করো না।

অর্জুনও জ্যেষ্ঠের তিরস্কার থেকে রেহাই পেলেন না। তাঁর উদ্দেশে বললেন—ধনঞ্জয়, তুমি চিরকাল শস্ত্রচর্চাই করেছ। ধর্মের সূক্ষ্ম নীতি উপলব্ধি তোমার সাধ্যাতীত।

নকুল, সহদেবও অগ্রজদের মতো যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মন তবু অশান্ত দেখে পাঞ্চালী বললে,—মহারাজ, আপনার অনুজেরা এতক্ষণ চাতকের ন্যায় আপনার উত্তরের প্রত্যাশী। আপনি এঁদের প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আপনার

অনুজেরা মত্ত বৃষ, উত্তেজিত গজেন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত। এঁদের দেখে আপনি প্রফুল্ল হোন। আপনার দেবতুল্য ভ্রাতারা শত্রুর পরাক্রম সহ্য করতে ও তাদের নিগ্রহও করতে পারেন।

আমি মনে করি এঁদের যে কেউ আমাকে সুখী করতে সমর্থ। কিন্তু আমি চাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মতো পঞ্চভর্তা একযোগে আমার সুখবিধান করুন। পাণ্ডবরা যে উন্মত্ত হবেন, সে আর বেশি কথা কি—তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতাই যখন উন্মত্তের মতো আচরণ করছেন! আপনার মতো অন্যেরাও যদি উন্মত্ত না হতেন তাহলে নাস্তিকদের সঙ্গে আপনাকেও বেঁধে রেখে তাঁরাই রাজত্ব করতেন!

ভার্যা ও ভ্রাতাদের শত যুক্তি-তর্কেও যুধিষ্ঠির আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তাঁর বৈরাগ্যের কথা জানতে পেরে মহাতপা ব্যাসদেব দেবস্থান ঋষিকে নিয়ে শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন।

তাঁদের অভ্যর্থনা ও প্রণাম করে যুধিষ্ঠির বললেন —ভগবন্, আমি মহা-পাপী। মিথ্যাচারী। গুরুজনের হত্যাকারী। আমার দোষেই পিতামহ ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠ কর্ণ, সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু এবং পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র নিহত। আমি আপনাদের নিকট অনশন-ব্রতে প্রাণত্যাগ করার অনুমতি চাইছি।

ব্যাসদেব বললেন—বৎস, তুমি সজ্ঞানে যে পাপ করেছ সেজন্য অনুশোচনা করছ বলেই পাপস্খালনের দুর্লভ সুযোগ পাবে। কিন্তু অনশনে প্রাণ-ত্যাগ করলে শুধু সেই সুযোগই হারাবে না, পরন্তু আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হবে। ক্ষত্রিয় রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। তুমি সেই যজ্ঞ সম্পাদন করে পাপমুক্ত হও, এই আমার উপদেশ।

কৃষ্ণও মহর্ষির কথামত যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে ব্রতী হতে অনুরোধ করলেন। সকলের পরামর্শে যুধিষ্ঠির শেষ পর্যন্ত যজ্ঞ সম্পাদনে সম্মত হলেন। অর্জুন অশ্বরক্ষক হয়ে বেরিয়ে পড়লেন দেশদেশান্তর অভিমুখে।

৩৩

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীর পরিচর্যা আর সুভদ্রা-উত্তরাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কর্তব্যে কোনো ত্রুটি ঘটে না; কিন্তু তবু যেন দিনের পর দিন একটা গভীর ভাব-ঘোরে আচ্ছন্ন থাকে পাঞ্চালীর দেহ-মন-ইন্দ্রিয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন চলছে হস্তিনাপুরে। অর্জুন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে। কৃষ্ণ অশ্বমেধের সূচনার পরে তার সঙ্গে দেখা না করেই দ্বারকায় ফিরে গেছেন। এসব খবরই শুনতে পায় যাজ্ঞসেনী। কিন্তু কোনো খবরই আর তার মনকে নাড়া দেয় না কোনোও ভাবে।

দেখতে দেখতে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় এগিয়ে আসে। আমন্ত্রিত হয়ে কৃষ্ণ আবার আসেন হস্তিনাপুরে। এসেই শুনতে পান উত্তরা জড়বৎ নিস্পন্দ সন্তান প্রসব করেই জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছে। সুভদ্রা-কুন্তীর হাহাকারে অন্তঃপুরে যেন শোকের ঝড় বইছে। মর্মাহত কৃষ্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখলেন জলসিঞ্চনে উত্তরার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে যাজ্ঞসেনী। কৃষ্ণকে দেখে সকলে বিলাপ করে উঠলেন। উত্তরা চোখ খুলে শিয়রে কৃষ্ণকে এসে দাঁড়াতে দেখে ধীরে ধীরে উঠে বসলো। তারপর নিস্পন্দ নবজাতককে কৃষ্ণের পদতলে রেখে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো। কুন্তী সরোদনে বললেন—মাধব, তুমি বলেছিলে উত্তরার মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করবে। এখন তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো।

উত্তরার নিস্পন্দ জড় শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণায় দ্রবীভূত হলো কৃষ্ণের হৃদয়। পদ্মাসনে আসীন কৃষ্ণের শ্যামল দেহ ধীরে ধীরে নিথর, নিস্পন্দ হয়ে গেল। ধ্যানলীন দেহটি ঘিরে একটা শুভ্র জ্যোতি ফুটলো। সেই জ্যোতিতে পরিব্যাপ্ত হলো চরণ-তলে শায়িত উত্তরার পুত্রের সর্বাঙ্গ। শিশুর দেহে ধীরে ধীরে চেতনার স্পন্দন জাগলো। সমবেত নারীদের হুলুধ্বনিতে ঘোষিত হলো উত্তরা-পুত্রের পুনর্জন্মের শুভ সংবাদ। কৃষ্ণ ভরত-বংশের একমাত্র উত্তর-পুরুষের নাম রাখলেন-- পরীক্ষিৎ।

দুন্দুভিবাদ্যে মুখরিত হস্তিনাপুরে অর্জুন ফিরে এলেন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে। দেশ-দেশান্তরের রাজা-রাজপুত্রেরা এসে উঠলেন যজ্ঞ উপলক্ষে নির্মিত শত শত প্রাসাদে। মঙ্গল-কলস ও তোরণমণ্ডিত পথ বেয়ে এলেন শত শত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। যজ্ঞ শুরু হলো। যজ্ঞবেদীর চতুষ্পার্শ্ব থেকে ঋত্বিকগণ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদান করতে লাগলেন। নানা পশুমাংস অগ্নিতে অর্পণ করার পর যজ্ঞাশ্ব বধ করে তার বসা, অস্থিমাংস অগ্নিতে উৎসর্গিত হলো। পাণ্ডবেরা অগ্নিতে সমর্পিত বসার পাপনাশক ধূম আঘ্রাণ করলেন।

যজ্ঞ শেষ হলে যজ্ঞেশ্বর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের দান করলেন সহস্র কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা। প্রধান হোতা ব্যাসদেবকে দান করলেন সমগ্র বসুন্ধরা। সমাগত রাজবৃন্দকেও প্রচুর ধনরত্ন, গো-অশ্ব, বস্ত্র-আভরণ, দাসদাসী দান করে পরিতুষ্ট করা হলো। রাজবৃন্দ একে একে বিদায় নিলেন। বৃষ্ণি বীরগণও বলরামকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সবশেষে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন কৃষ্ণ। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী, কুন্তী, সুভদ্রা ও উত্তরার কাছে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ যাজ্ঞসেনীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তার কক্ষের দিকে গেলেন।

খোলা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের চোখে পড়লো ঝরোকার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছে পাঞ্চালী।

মৃদু স্বরে ডাকলেন কৃষ্ণ : সখি কৃষ্ণা।

মুখ ফিরিয়ে দ্বারপ্রান্তে কৃষ্ণকে দেখে পাঞ্চালী উঠে দাঁড়ালো। কৃষ্ণ নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করলেন। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হলো। দুজনের চোখেই বিস্ময়।

কৃষ্ণ বিস্মিত সেই রসময়ী, কৌতুকপ্রিয়া, দীপ্তিময়ী প্রজ্ঞাপারমিতা শক্তি-ময়ী কৃষ্ণাকে যেন জীবনের সব রূপ-রস-আনন্দ খুইয়ে পাষাণীতে পরিণত

হতে দেখে। কৃষ্ণের মনে হলো, যাজ্ঞসেনীর অন্তরের বেদনা উপলব্ধি পাণ্ডবদের সাধ্যাতীত। যোগিনীর মতো জীবনকে অস্বীকার করে নয়, সর্বনাশীর মতোই জীবনটাকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে এক অনাসঙ্গ নারী যেন দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে। পঞ্চ ভর্তৃকা, পঞ্চপুত্রের জননী যেন অহল্যার মত পাষাণী হয়ে গেছে! যেন বলছে, সখা, দেখো, কেমন তিলে তিলে মরে আমি তিলাঞ্জলি দিয়েছি জীবনের মর্মবেদীতে।

পাঞ্চালীও বিস্মিত! যাঁর মোহন রূপ কিশোরী চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল, সেই অসুর-নাশকারী, ধর্মের রক্ষক, অধর্মচারীর শমন, মহাভারতের মহানায়ক, কূটনীতিবিশারদ, অর্জুন-সারথি, মহাভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের স্রষ্টাকর্তা, রূপ-শৌর্য-বিদ্যা-প্রজ্ঞা-মননের প্রতিমূর্তির পরিবর্তে এ কোন্ বিবাগী কৃষ্ণ আজ এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে! এঁর দুটি আয়ত চোখে একি নিরাসক্ত দৃষ্টি! সে দৃষ্টি যেন এমন এক মানুষের—যাঁর দেশ নেই, স্থিতি নেই। নেই দুঃখ, শোক। আশা, আকাঙ্ক্ষা। যেন শুধু এক অনিবার্য পরিণতির ধ্রুব চেতনায় উদ্দীপ্ত এক সাধক।

মৌনতা ভঙ্গ হলো কৃষ্ণের গাঢ় স্বরে। বললেন—সখি কৃষ্ণা, আজ আমি এসেছি তোমার কাছে বিদায় নিতে। পাপের ধ্বংসলীলার সূচনা মধ্য-ভারতে, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর ভারত পরিব্যাপ্ত করে এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণে। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়-নিধনের পর যাদবগণের মহাবিনষ্টি যেন আসন্ন বলে মনে হচ্ছে। সুরা আর নারীলোলুপ অশুভ শক্তির ধ্রুব বিনাশের সূচনা ঘটাতে আমাকে যেতে হবে প্রভাস-তীর্থের কলঙ্ক মোচনে।

—আবার কবে দেখা হবে সখা?

—না সখি। মন বলছে এই আমাদের শেষ দেখা। এরপর একদিন জীবনের সব চঞ্চলতা মিলিয়ে যাবে মহামৃত্যুর মাঝখানে। অস্তিত্বের ইতি ঘটবে একটা সর্বগ্রাসী শূন্যতায়। তাই যাবার আগে বলে যাই, তোমার এই মুহূর্তের অনুভব, তোমার এই অখণ্ড রিক্ততাবোধই সত্য। এমনি করে একান্তভাবে রিক্ত হয়েই তুমি, আমি, আমরা সবাই, এগিয়ে যাব পূর্ণতার দিকে।

ক্ষণিক বিরতির পর কৃষ্ণ আবার বললেন—সখি, তুমিই ছিলে আমার প্রেরণা। আমার কর্মসাধনার পরামন্ত্র। তোমার জীবনের শূন্যতা তোমাকে যেমন পাষাণী করে তুলেছে, আমাকে তেমনি টেনেছে নির্বীর্যতার গহন অতলে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করলেও সৃষ্টির নব সূচনা আমি করতে পারি নি।

আমার এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে লোকমাতা গান্ধারীর অশ্রুসিক্ত অভি-সম্পাত আর ক্ষত্রচূড়ামণি কর্ণের হৃদয়-মথিত দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু সেজন্য কোনও দুঃখ নেই আমার। আমি যেমন ধ্বংসের নিমিত্ত রূপে এসেছি, তেমনি সৃষ্টির নিমিত্ত হয়ে হয়তো কোনো পুরুষোত্তমের আবির্ভাব ঘটবে এই ভারতভূমিতে। যতদিন না তা ঘটছে ততদিনই চলবে সেই জ্যোতি-র্গময়ের সাধনা।

নতজানু, গলবস্ত্রা পাঞ্চালী স্তব্ধচিত্তে তাকিয়ে রইলো কৃষ্ণের দিকে। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে জীবনের তমিস্রা ভেদ করে আলোকে উত্তরণের প্রতীক্ষারতা পাঞ্চালীর দৃষ্টিপথ থেকে ধীরে ধীরে অপসৃত হলো কৃষ্ণের সমাহিত মূর্তিখানি।